বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

মুজিব বর্ষ বিশেষ সংখ্যা

১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

মুজিব বর্ষ বিশেষ সংখ্যা

১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

(মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা)

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

(মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বিপিএটিসিতে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ সেমিনারের মূল প্রবন্ধ সমন্বয়ে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা)

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান সম্পাদক : মোঃ রকিব হোসেন এনডিসি, রেক্টর

নির্বাহী সম্পাদক : ড. শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক, এমডিএস

সম্পাদক : ড. এম আরিফুর রহমান, পরিচালক

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে 'মুজিববর্ষ'। যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিববর্ষ পালন করার উদ্দেশে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহের অন্যতম ছিল বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ সেমিনার আয়োজন। মুজিববর্ষে বিপিএটিসিতে বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও দর্শন সংশ্লিষ্ট থিম/বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক বারটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ জাতির পিতার জীবনের বিভিন্ন দিক বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ সেমিনার আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশেষতঃ প্রজাতন্ত্রের নবীন কর্মচারীদেরকে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা যাতে তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশ সেবার মহানব্রতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারেন। সেমিনারে বিপিএটিসি কর্তৃক সরকারের যুগ্ম সচিবদের জন্য পরিচালিত সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, সরকারের উপসচিবদের জন্য পরিচালিত উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে নবনিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য পরিচালিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, বিপিএটিসির অনুষদ সদস্যবৃন্দ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব ও সিনিয়র সহকারি সচিব পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুষদ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান, শিক্ষাবিদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশীদ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এমপি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণলয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচটি ইমাম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম এমপি, দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ও সাবেক সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী।

বিপিএটিসিতে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে প্রকাশিত বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন

পত্রিকা'র মুজিববর্ষ সংখ্যাটি বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ সেমিনারে পঠিত বারটি প্রবন্ধের সংকলন। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে উল্লিখিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত ব্যক্তিগত। প্রতিটি প্রবন্ধে প্রবন্ধকারগণ যে সকল তথ্য-উপাত্ত ও দর্শন উপস্থাপন করেছেন তা ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রত্যেক প্রবন্ধকারকে বিপিএটিসির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

মোঃ রকিব হোসেন এনডিসি
রেক্টর, বিপিএটিসি ও
প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

মুখবন্ধ

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে দেশের শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ সেমিনারে উপস্থাপিত বার টি প্রবন্ধ গ্রন্থিত করে বিপিএটিসি কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী 'বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন পত্রিকা'র মুজিববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ একটি মহতী উদ্যোগ। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' হিসেবে এ জন্য আমি গর্বিত। একথা অনস্বীকার্য, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ অবিভাজ্য সত্ত্বা। দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তাঁর অবদান বিবৃত রয়েছে এইসব প্রবন্ধে। প্রবন্ধগুলোর সংকলনের ফলে এগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হিসেবে সমাদৃত হবে। প্রকৃতপক্ষে, এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি 'Centre of Excellence' অভিধায় ভূষিত হওয়ার যথার্থতা প্রমাণ করেছে। বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতি সত্ত্বেও রেক্টর মোঃ রকিব হোসেন এনডিসি এর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং দিক নির্দেশনার মাধ্যমে সকল চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

জ্ঞানগর্ভ এবং তথ্যবহুল বক্তৃতামালা সংকলনের কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়। এই কঠিন, শ্রমসাধ্য কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেমিনারগুলোর সফল আয়োজনের লক্ষ্যে অনুষদবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থাপনা টিমসমূহের সদস্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমন্ত্রিত প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ সকলেই সমাজের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিপিএটিসি'র ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরা আমাদের আয়োজন সাফল্যমন্ডিত করতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

সেলিনা হোসেন
বঙ্গবন্ধু চেয়ার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় iii

মুখবন্ধ v

বঙ্গবন্ধু: স্বপ্নচারী ও সম্মোহনী নেতা ০১
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও দর্শন ১৬
আতিউর রহমান

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু ২৭
রফিকুল ইসলাম

১৯৬০ এর দশকে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি: ৬ দফা (আমাদের বাঁচার দাবি), ১১ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ৩৪
হারুন-অর-রশিদ

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ৪৫
আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ৫৪
ফরহাদ হোসেন

দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান ৬৫
কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ

বঙ্গবন্ধু ও সিভিল সার্ভিস ৭৩
এইচ টি ইমাম

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ৮৪
মো: শাহরিয়ার আলম

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ৯১
মোঃ মোজাম্মেল হক খান

লেখক হিসেবে বঙ্গবন্ধু ১০৪
শামসুজ্জামান খান

রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু ১১৫
কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু: স্বপ্নচারী ও সম্মোহনী নেতা

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন [১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে প্রথমে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের ধারণাগত বিশ্লেষণ (conceptual analysis) প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নচারী এবং সম্মোহনী নেতৃত্ব বিষয়ক আলোচনার অবতারণা এবং এ আলোচনায় দু'টো পর্ব থাকবে। প্রথমত, তত্ত্ব এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইতিহাসকে ফিরে দেখার মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলীর বিশ্লেষণ করা হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমত প্রশ্ন আসে যে নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়। বহুবিধ সংজ্ঞা আছে, তবে মোটা দাগে বলা যায় - নেতৃত্ব হচ্ছে একজন ব্যক্তির সামর্থ্য এবং পারঙ্গমতা, যার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তি এবং জনসমষ্টিকে একটি লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করতে পারেন। সকলের পক্ষে এটি পারা সম্ভব হয় না। নেতারাই তা পারেন। নেতারা জানেন কীভাবে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে হয় এবং অনুগামীদের কীভাবে পেতে হয়, নেতার লক্ষ্য অর্জনের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য। এ প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি Dwight D. Eisenhower বলেছেন, "Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it." তবে এর চেয়েও ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন মার্কিন অধ্যাপক ও নেতৃত্ব গবেষক Gary Wills। তিনি বলেছেন,

> "Leaders have a vision, Followers respond to it. Leaders organise a plan. Followers get sorted out to fit the plan. Leaders have willpower, Followers let that will replace their own.....the leader is one who mobilises others toward a goal shared by a leader and followers" [২]

তবে নেতৃত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু নিয়ে প্রাচীন চীনের ঐতিহ্যে বেশ কিছু ভালো কথা বলা আছে। সেই কথাগুলোই আলোচনার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। যেমন-

> Leadership is a matter of intelligence, trustworthiness, humanness, courage, and discipline. Reliance on intelligence alone results in rebelliousness. Exercise of humaneness

১ বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্

২ Gary Wills (1994), "What Makes a Good Leader" *The Atlantic Monthly.*

alone results in weakness. Fixation on trust results in folly. Dependence on the strength of courage results in violence. Excessive discipline and sternness in command result in cruelty. When one has all five virtues together, each appropriate to its function, then one can be a leader.[৩]

নেতৃত্বের সামগ্রিক বিষয়টি চমৎকারভাবে উঠে এসেছে চৈনিক এই উদ্ধৃতির মধ্যে, ঐতিহ্যের মধ্যে। সে কারণেই এটি আলোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে।

স্বপ্নচারী নেতৃত্ব

শুরুতেই থাকবে নেতৃত্ব সংক্রান্ত সাধারণ কিছু কথা। এরপর দুটো সুনির্দিষ্ট বিষয়- স্বপ্নচারী এবং সম্মোহনী নেতৃত্ব, যা নিয়ে এ লেখার অবতারণা। ব্যাপক অর্থে স্বাপ্নিক নেতা তিনিই যিনি একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিজে দেখেন এবং দেখাতে পারেন। অনুসারীদের সেই স্বপ্নে অনুগামী করতে পারেন। সেই কারণে একজন স্বপ্নচারী নেতা তিনিই যার সামনে সুনির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনার ছক আছে। তিনি বায়বীয় কথা বলেন না, যা আমরা প্রায়শ শুনি। তিনি তাঁর লক্ষ্যের কথা বলেন, তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। সেদিকেই আমরা সাধারণ মানুষ সকলেই যাব এবং কীভাবে যাব, তা তিনি নিজে করে দেখান। সেই জন্যে আমাদের নৈমিত্তিক জীবনে আমাদের যে আকাঙ্খা, যে অভীপ্সা আছে, সেগুলো নিয়ে স্বপ্নচারী নেতার সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং লক্ষ্য থাকে। আমরা নেতার নেতৃত্বে যখন পরিচালিত হই, এবং লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যাভিসারী হই তখন সেই নেতাকে আমরা স্বপ্নচারী বলি। তবে সাধারণত দেখা যায় যে, নেতৃত্ব গবেষকবৃন্দ স্বপ্নচারী নেতার যথাসম্ভব ১৫ টি বৈশিষ্ট্য তুলে এনেছেন। সেগুলো হলো -

১. তিনি সামগ্রিক চিন্তার অধিকারী হন এবং সবসময় সচেতন থাকেন, সতর্ক থাকেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় খণ্ডিত কিছু থাকে না। মানুষের জন্য তার যে ভাবনা তাঁর সামগ্রিকতা আছে।

২. তিনি উদ্ভাবনী হবেন। গতানুগতিকায় বিশ্বাসী নন। গতানুগতিক কর্মকাণ্ডে তাঁকে কখনোই দেখা যায় না।

৩ Jia Lin in commentary on Sun Tzu, The Art of War: Complete Texts and Commentaries, 2003, P.44 translated by Thomas Cleary

৩. তাঁর নিজের স্থির বিশ্বাস থাকে। অর্থাৎ তিনি যা বলছেন, করছেন সে সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস খুব দৃঢ়।

৪. তিনি নিজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিজের কাছে, জনগণের কাছে।

৫. তিনি নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করে যান। তাঁর কাজের কোন ছেদ নাই। সবাইকে নিয়ে তিনি কর্মরত থাকেন, ক্রিয়াশীল থাকেন।

৬. তিনি ভালো যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁর অনুসারীদের সাথে, তাঁর সহকর্মীদের সাথে যা বলেন তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তিনি খুব ভালো communicator.

৭. তিনি কুশলী হন। রাজনীতিতে কৌশল দরকার, অপকৌশল নয়। অর্থাৎ সাদা-মাটা, বুদ্ধিহীন মানুষ কখনো নেতা হতে পারেন না, স্বপ্নচারী তো নয়ই।

৮. তিনি নিবেদিত কর্মবীর। অন্নদাশংকর রায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে একটি চমৎকার মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে একটি জায়গায় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন, ব্রতে নিবেদিত কর্মবীর। স্বপ্নচারীরা এমনই হন।

৯. বিনয়ী ও সৌজন্য আচরণিক। নিজেকে অনেক ছোট ভাবে, সবাইকে বড় ভাবে। যে নিজেকে বড় ভাবে সে সবাইকে ছোট ভাবে। সে নিজেকেই নেতৃত্ব দেয়, মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারে না।

১০. তিনি একা কাজ করেন না, সবাইকে নিয়ে কাজ করেন। তিনি যদি দলীয় নেতা হন, নেতা তৈরি করেন। তিনি যদি অনুপস্থিত হয়ে যান, অবর্তমান হয়ে যান, তাতে কর্মক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়বে না, চালু থাকবে। তিনিই আসল নেতা, তিনিই স্বপ্নচারী নেতা। কিন্তু যিনি নিজের নেতৃত্বকে চূড়ান্ত মনে করেন, নেতৃত্ব গড়ে উঠতে দেন না, বটগাছের নিচে আগাছা হতে দেন না। তিনি আপন নেতৃতে বিভোর। দেশ এবং জনগণের নেতৃত্ব তিনি দিতে পারেন না। স্বপ্নচারীতো হতেই পারেন না।

১১. কাজে নিবেদিত মানুষ। কথায় নয়, তিনি কাজ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চান যে, তিনি যা বলছেন তাঁর সমান্তরালে আছে তাঁর কাজ।

১২. তাঁর চিন্তা-চেতনায় একটি জঙ্গম শক্তি আছে। তিনি নিয়ত নিজেকে অতিক্রম করে যান।

১৩. নীতি ও আদর্শকে বাদ দিয়ে, জলাঞ্জলি দিয়ে তাৎক্ষনিক স্বার্থ উদ্ধারের যে রাজনীতি, সেই

রাজনীতিতে তাঁর আস্থা কোনদিনই থাকে না। তাঁর জায়গা কখনও থাকে না। চিরায়ত আদর্শ ও নীতির প্রতি তাঁর আস্থা অবিচল।

১৪. তাঁর অনুসারী জনগণকে তিনি পরম ভালবাসেন। যাদের নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন, তাদের ভালবাসায় তিনি সিক্ত হন। তাদেরকেও খুব ভালবাসেন। পারস্পরিক ভালবাসার মধ্য দিয়ে স্বপ্নচারী নেতৃত্বের উদ্ভব এবং বিকাশ।

১৫. তিনি সবাইকে উৎসাহিত করতে পারেন, প্রণোদিত করতে পারেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে দেখলে, যার কথা শুনলে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি অনুসারী উৎসাহিত হয়, প্রণোদিত হয়। যে নেতা, প্রতিষ্ঠানেরই হোন, দলেরই হোন বা দেশেরই হোন, তিনি যদি হতাশাবাদী কথা বলেন তবে তিনি নেতা নন। অর্থাৎ, নেতা হতাশাগ্রস্ত হতে পারেন না। যে নেতা হতাশাবাদী কথা বলেন তিনি নেতা নন, দোষে-গুণে একজন গড়পড়তা মানুষ। নেতাকে সাধারণ মানুষের স্তর অতিক্রম করে যেতে হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে, সম্মোহন দিয়ে। সুতরাং, নেতৃত্ব গবেষকদের কাছ থেকে স্বপ্নচারী নেতার এই ১৫ টি বৈশিষ্ট্য আমরা পাই ।

সম্মোহনী নেতৃত্ব

ক্যারিশমা তত্ত্বটি বা ভাবনাটি এসেছে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Max Weber এর কাছ থেকে। যাঁর কথা শুনলে মানুষ প্রণোদিত হতে পারে। সম্মোহনী নেতা তাঁকেই বলা হয় Max Weber-এর মতে – যিনি তাঁর চারপাশের জনগণকে উৎসাহিত করতে পারেন, প্রণোদিত করতে পারেন। যাঁকে দেখলে, যাঁর কথা শুনলে জনগণ উৎসাহিত হয়ে উঠে, ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হতে পারে। এমন মানুষকেই আমরা সম্মোহনী নেতা বলি। তাঁর উপস্থিতি, তাঁর কথা, তাঁর অস্তিত্ব সবকিছুই যেন মানুষের বিস্তর সাহস, উদ্দীপনা আর ভবিষ্যৎ ভাবনার প্রণোদনা হয়ে যায়। সে জন্য দেখা যায়, যে সম্মোহনী নেতা সবসময় তাঁর চারপাশের মানুষকে, তাঁর অনুসারীদেরকে প্রেরণা যোগান। সম্মোহনী নেতার সবচেয়ে বড় গুণটি হচ্ছে, তিনি যা বলেন তা জনগণের মনে গেঁথে যায়। তারা উৎসাহিত হয়, প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। তাঁদেরকেই সম্মোহনী নেতা বলা হয় যাদের কথায় এবং কাজে তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে বিস্তর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মানুষ তখন আশায় উদ্দীপিত হয়ে উঠে সেই সম্মোহনী নেতার কথায়, তাঁর কাজে। ১৯৮৮ সালে, দু'জন গবেষক Jay Conger এবং Rabindra Kanungo একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যার শিরোনাম ছিল "Charismatic Leadership"। এই প্রবন্ধে তারা গবেষণা করে বাস্তব পরিস্থিতি থেকে উৎসারিত সম্মোহনী নেতার কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। ১৯৯২

সালে আরও দুজন গবেষক Robert House এবং Jane Howell নতুন করে ভেবে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা আগের দু'জন গবেষককে অনুসরণ করে দেখবার চেষ্টা করেন, তাঁরা যা বলেছেন তা কতটুকু সঠিক। তাঁদের প্রবন্ধের নাম ছিল "Personality and Charismatic Leadership"। এই চারজন গবেষকের গবেষণাপত্র থেকে আমরা সম্মোহনী নেতার কিছু বৈশিষ্ট্য পাই। তা হলো–

১. তিনি স্বপ্নচারী হবেন।

২. তিনি স্পষ্টবাদী হবেন। কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবেন না, ইনিয়ে বিনিয়ে বলবেন না।

৩. তিনি সংবেদনশীল মানুষ। মানুষের দুঃখ, বেদনা, আনন্দ উল্লাস সবকিছুতেই তিনি আলোড়ন বোধ করেন।

৪. ঝুঁকি নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন তিনি।

৫. সৃজনশীল। নিত্য নিয়ত সৃজন করে যান যিনি তাঁর কর্মে।

৬. প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী। নিজের মধ্যে বিশ্বাস ধারণ না করলে সবার মধ্যে তা সঞ্চারণ করা যায় না। তিনি কেবল মুখের কথায় কথা বলেন না বরং দেহের ভাষায় কথা বলেন। অর্থাৎ মঞ্চে অভিনেতা বা অভিনেত্রী যেমন করে মুখের সংলাপ এবং দেহের ভাষায় দর্শকদের বিমোহিত করেন, সম্মোহনী নেতার তেমন গুণ থাকতে হয়।

স্বপ্নচারী বঙ্গবন্ধু

নেতৃত্বের এই তাত্ত্বিক কথা বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগ করা যায় তার ওপর আলোকপাত করতে গেলে প্রথমেই দেখা যাক, বঙ্গবন্ধু কতটুকু স্বপ্নচারী নেতা ছিলেন, সেই বিষয়টি। ইতিহাসের পেছনের পাতায় ফিরে দেখা যাক, বেশি পেছনে না গিয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ বা ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ তার নির্মম লোকান্তরণের পূর্ব পর্যন্ত। নানাবিধ ঘটনা আছে যার মধ্য দিয়ে তার এই স্বপ্নচারিতা প্রমাণ করা যায়। যেমন ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তখন ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলে ২৪ নং নম্বর কক্ষে থাকতেন। সেখানে একদিন তিনি বিছানার উপর বসে, চারজন সঙ্গী নিয়ে পাকিস্তান নিয়ে বেশ কিছু কথা বললেন। প্রথম কথাটি ছিল এই যে, এই পাকিস্তান, যে পাকিস্তানের জন্য তিনিও লড়াই করেছেন হোসেন শহীদ

সোহরাওয়ার্দির শিষ্য হিসাবে, সে পাকিস্তান নয়। লাহোর প্রস্তাবের বিকৃতি হিসাবে পাকিস্তানের উদ্ভব হলো। কাজেই এই পাকিস্তান বাঙালির স্বার্থ রক্ষা করবে না। তাঁর স্পষ্ট কথা তখনই বলে দিলেন। সুতরাং ঢাকায় ফিরে গিয়ে নতুন করে বাঙালির জন্য আন্দোলন শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় কথাটি মেঠো বাংলায় বললেন "ঐ মাউড়াদের সঙ্গে বেশিদিন থাকা যাবে না"। কী চমৎকার ঐতিহাসিক মন্তব্য! মেঠো বাংলায়, অবাঙালি ঐ পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালিরা বেশিদিন থাকতে পারবে না। সত্যিই তারা থাকেনি। বাঙালি থেকেছিল ২৪ বছর ৪ মাস তিন দিন। সেইজন্যই ১৯৭২ এ অন্নদাশংকর রায় বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কবে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ভেবেছিলেন। বঙ্গবন্ধু নির্দ্বিধায় বলেছিলেন ১৯৪৭ থেকে। ইতিহাস তাই বলে।

১৯৪৭-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত সাপ্তাহিক *মিল্লাত* পত্রিকা। সেই পত্রিকার সম্পাদকের অফিসে বসে একটি অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় একটি প্রসঙ্গে শেখ মুজিব (তখনও বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত হননি) বললেন, এই যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি হোল, তার রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। কারণ বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৫৪ভাগ মানুষের ভাষা বাংলা। বইতে লেখা আছে, বুদ্ধিজীবীরা লেখেন ৫৬ ভাগ। কিন্তু তারা ভুলে যান ২ ভাগ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কথা, যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। আসলে বাংলা মাতৃভাষা যাদের তাদের আনুপাতিক হার ছিল ৫৪ ভাগ। সেই থেকেই ভাষা আন্দোলনের শুরু- সেই ১৯৪৭ থেকেই। তাই বঙ্গবন্ধুই ভাষা আন্দোলনের দ্রষ্টা। সে কারণেই ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ সাল থেকে নয়, ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু।

১৯৬১ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু, তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেননি, তাঁর পরিচয় তখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। আমরা জানি যে, আওয়ামী লীগ যাত্রা শুরু করেছিল ৪২ দফা দাবি নিয়েই; তার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। সব দাবিই ছিল বাঙালির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। তারপরেও শেখ মুজিবুর রহমান, নিজে নিজে তৈরি করলেন পূর্ববঙ্গ মুক্তিফ্রন্ট। তিনি একটি লিফলেট ছাপালেন নিজের অর্থে এবং বিলি করলেন বাঙালির দ্বারে দ্বারে। লক্ষ্য করলে বিস্মিত হই আমরা যে, স্বাধীনতার স্বপ্নে কতটা বিভোর হলে একটি মানুষ তাঁর লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য কতটা কর্মবীর হতে পারেন।

আরেকটি ঘটনা। তখন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। বঙ্গবন্ধু তাঁকে মানিক ভাই বলতেন। সেই মানিক ভাইয়ের মধ্যস্থতায় বাম ঘরানার দুজন স্বকীর্তিখ্যাত নেতা কমরেড মনি সিংহ এবং কমরেড খোকা রায়ের সাথে একটি গোপন বৈঠক করলেন। বৈঠকের মুল বক্তা শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কথা একটাই। বাঙালির সব সমস্যার সমাধান হবে স্বাধীনতা পেলে। কমরেড দু'জন বললেন আপনার কথা মানলাম, কিন্তু এখনও

আইয়ুব খানের সরকার দেশে। স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যে বললে আপনার বিপদ হবে। সভা শেষ হোল শেখ মুজিবের একটি কথায়, "দাদা আপনাদের কথা মানছি, কিন্তু আমার কথাটাই রইল"। বাঙালির স্বাধীনতা প্রয়োজন। এই ছিল তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্ন।

১৯৬৮ তে বঙ্গবন্ধু তখন আগরতলা মামলার আসামী। একদিন তাকে বাসযোগে সামরিক আদালতে নেয়া হচ্ছে। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্যতম অভিযুক্ত আসামী বর্তমানে প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ভূতপূর্ব ডেপুটি স্পীকার শওকত আলী । তিনি বিমর্ষভাবে বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করলেন যে আমাদের ভবিষ্যৎ কী? বঙ্গবন্ধু হেসে বললেন, এই বিচার করতে পারবে না পাকিস্তানীরা। জনরোষের কারণে এই বিচার স্তব্ধ হয়ে যাবে। তারপরে পাকিস্তান সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হবে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভূমিধস বিজয় অর্জন করবে; কিন্তু ক্ষমতা পাবে না। তারপরেই শুরু হবে হৈ-হট্টগোল। বঙ্গবন্ধু দু'টো শব্দ ব্যবহার করেছেন – হৈ, হট্টগোল। আপনারা লক্ষ্য করুন, বঙ্গবন্ধু ঠিক যেভাবে বলেছেন সেইভাবেই ঘটনাপ্রবাহ পরিচালিত হয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধু জ্যোতিষী ছিলেন না। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে অতীন্দ্রিয় চেতনা বেশি পরিমাণে ছিল। মনস্তত্ত্ববিদরা যাকে ইংরেজিতে বলেছেন ESP (Extra-Sensory Perception), যা একজন নেতার থাকা বাঞ্ছনীয়, নইলে নেতৃত্ব দেয়া যায় না। Extra-Sensory Perception – নিয়ে নিবন্ধকের কিছুটা পড়াশুনা করতে হয়েছে। কারণ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়তে গিয়ে তাকে psycho-history-র একটি কোর্স করতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের Extra-Sensory Perception নিয়ে ইতিহাসবিদদের ভাবতে হয়। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে Extra-Sensory Perception যথেষ্ট ছিল বলে তথ্য প্রমাণ আমাদের জানিয়ে দেয়।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু বললেন, "জনগণের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিতেছি যে এই প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের নাম হইবে বাংলাদেশ"। নিবন্ধক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তরুণরা এরপর থেকে আর পূর্ব পাকিস্তান বলেনি, বাংলাদেশ বলেছে। কাগজপত্রে পূর্ব পাকিস্তান লিখতে হয়েছে পাকিস্তানের সময়ে। তবে একথা সবার জানা উচিত যে, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে তরুণ প্রজন্ম রাজপথে স্লোগান দিয়েছিল - "*বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর*"। বঙ্গবন্ধু সেই "বাংলাদেশ" কথাটি বললেন।

১৯৬৯ সালের ৬ ডিসেম্বর পত্রিকা যখন ছাপা হলো, তখন দেখা গেল বর্ষীয়ান বাঙালি রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং আতাউর রহমান খান বিবৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এর পেছনে অনেক যুক্তি আছে। এরপর ১৯৬৯ এর ২৫শে মার্চ, আইয়ুব

খান বিদায় নিয়ে ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা দিয়ে গেলেন। সামরিক শাসন থেকে সামরিক শাসন। আইয়ুব খান শেষ দিকে বেসামরিকীকরণ করেছিলেন, উর্দি ছেড়ে স্যুট পরেছিলেন, তবে শাসনটা সামরিক কায়দায়ই চলছিল। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন ১৯৭০-এর শেষদিকে সাধারণ নির্বাচন হবে। বাঙালি হলো উল্লসিত, আলোড়িত । কিন্তু তার পরপরই তিনি একটি ফতোয়া জারি করলেন। যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে Legal Framework Order (LFO) 'আইনি কাঠামো আদেশ'। নির্বাচন কীভাবে হবে, নির্বাচন পরবর্তী কী কাজ করবেন রাজনীতিবিদরা, আষ্টেপৃষ্ঠে হাত পা বেধে দিলেন। ২৫ ও ২৭ ধারায়, স্পষ্ট করে বলা হলো যে, পাকিস্তানের লক্ষ্য আদর্শ কোনকিছুই পরিবর্তন করা যাবে না। ১২০ দিনের মধ্যে নতুন সংবিধান রচনা করতে হবে। কারণ ১৯৬২ সালে প্রণীত সংবিধানটি বাতিল হয়ে গেছে। তখন আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা গেল। আওয়ামী লীগ যা চাচ্ছিল তা ততদিনে পরিষ্কার। তা হোল ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে নতুন সংবিধান রচিত হবে। উল্লেখ্য, ৬ দফা -একটি স্বপ্নের ঠিকানা নির্মাণ করেছিল বাঙালির জন্য। সেই স্বপ্ন অনুযায়ী যদি সংবিধান রচনা করতে হয় তা হলে ইয়াহিয়া খান যা বলেছিলেন তার বিরুদ্ধে চলে যাবে। সেজন্য আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই তখন নির্বাচন করতে চাননি। তারা ভেবেছিলেন যে, নির্বাচন করে লাভ নেই বরং আন্দোলন করি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী সবময়। তিনি কিন্তু চাইলেন যে নির্বাচন হবে। তখন তিনি একটি কথা বলেছিলেন যা সামরিক গোয়েন্দারা টেপে ধারণ করে ইয়াহিয়া খানকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'নির্বাচনের পর আমি এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলব। আমার লক্ষ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা'। ইয়াহিয়া খানকে এই টেপ শোনাবার পরে বলেছিলেন, 'যদি শেখ মুজিব আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তাঁকে আমি দেখে নিব'। [৪]

১৯৭০ এর নির্বাচনের আগে, নভেম্বরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় হোল। ৫ থেকে ১০ লাখ মানুষ হতাহত হলো, পাকিস্তান সরকার উদাসীন ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজে ত্রাণের কাজকর্ম শেষ করে নানা বক্তব্য-বিবৃতিতে পাকিস্তান সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন। তখন নির্বাচন হবে কি হবে না এটি নিয়ে সংশয় দেখা দিল। মাওলানা ভাসানী স্লোগান দিলেন 'ভোটের আগে ভাত চাই', 'ভোটের বাক্সে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' । মাওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP) নির্বাচন বয়কট করল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন এবং বললেন উপদ্রুত এলাকায় নির্বাচন পরে হবে, নির্ধারিত তারিখে অন্যান্য

৪ This statement was secretly recorded by the Pakistan Military Intelligence, which Yahya Khan listened to and commented, " If Mujib betrays me I will fix him" . History bears that Mujib did betray, but Yahya failed to fix him; and Mujib's betrayal culminated in the independence of Bangladesh.

নির্বাচন হতে হবে। তাই হয়েছিল।

পাকিস্তানে কর্মরত সাংবাদিক Anthony Mascarenhas বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শামসের গণহত্যার বিবরণ তিনি লন্ডন থেকে প্রকাশ করেছিলেন। নির্বাচনের তিন দিন আগে তিনি বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনার দল কয়টি আসন পাবে। বঙ্গবন্ধু কাল বিলম্ব না করে বলেছিলেন, নির্ধারিত ১৬৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পাবে ১৬৭টি। আর দুটো আসন পাবেন ময়মনসিংহ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী পিডিপি নেতা নূরুল আমিন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়। ফলাফল তাই হয়েছে। তাঁর কাছে তথ্য ছিল। তার Extra-Sensory Perception ছিল, যার ভিত্তিতে তিনি সঠিক কথা বলতে পেরেছিলেন। অথচ পাকিস্তান গোয়েন্দাবাহিনী, সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী, ইয়াহিয়া খানকে বুঝিয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ ৮০ টির বেশি আসন পাবে না। মার্কিন নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তাই বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন অন্য কথা। যা পরে সত্য প্রমাণিত হয়। তিনি আরও একবার তাঁর বিচক্ষণতা প্রমাণ করলেন।

একটি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন, যা তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে দেখে আসছিলেন, তা সমন্বিত আকারে উঠে এসেছিল ৭ মার্চের ভাষণে। Andrew Newberg এবং Robert Waldman মতে, সেদিন যারা তাঁর কথা শুনেছিলেন, তাদের মনোজগতে পরিবর্তন আসে।[৫] বিভ্রান্ত বাঙালি জাতি সেদিন পেয়েছিল পথের দিশা। তাঁর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিলোঃ ‘এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। এটি লক্ষ্যণীয়, স্বাধীনতার আগে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণে চার বার ‘মুক্তি’র কথা বলা হয়েছে, ‘স্বাধীনতা’ একবার বলা হয়েছে। অলিখিত, ১৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ড, নিবন্ধকের নিজের ঘড়ির হিসাব অনুযায়ী, ১৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে ১১০৮ টি শব্দের ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর জীবনে সংক্ষিপ্ততম অলিখিত ভাষণ। এই ভাষণে বাঙালির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে। জনগণের গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তি স্বাধীনতার স্বপ্নের প্রকাশ এই ভাষণ। বাঙ্গালির রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস - সেই শশাঙ্ক থেকে শুরু করে,ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে, যে বাঙালির ইতিহাস (তারও আগে ইতিহাস আছে) তারই সন্নিবেশ হয়েছে এই ৭ মার্চের ভাষণে। এর মধ্য দিয়ে একটি বাঁকবদল ঘটেছিলো বাঙালির মানসিকতার । বাঁক বদলের অনুঘটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিন তিনি জননন্দিত রাজনীতিবিদ থেকে জননন্দিত রাষ্ট্রনায়কে উন্নীত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত,

৫ Andrew Newberg and Robert Waldman, Words Can Change Your Brain (Pennsylvania: Avery, 2012)

এই ভাষণটি ৩০ অক্টোবর ২০১৭ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন UNESCO-র বিশ্ব প্রামাণিক ঐতিহ্যের অংশ। উল্লেখিত, ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ইউনেস্কো সৃজনশীল অর্থনীতিতে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করে। এমন পুরস্কার আরও ২৩ জনের নামে আছে।

পাকিস্তান জেলে ২৯০ দিন অতিবাহিত করার পর, ১৯৭২ এর ৮ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধু মুক্ত হলেন। লন্ডনে পৌঁছে ঐদিনই লন্ডনের 'Claridges' হোটেলে প্রথম সংবাদ সম্মেলন করছেন বঙ্গবন্ধু। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন "আপনি বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে কী করবেন? সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত একটি দেশ"। বঙ্গবন্ধু স্বভাবসুলভ আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমার মাটি ও মানুষ যদি থাকে আমি আবার উঠে দাঁড়াব"। প্রকৃতপক্ষে, মাটি ও মানুষ দু' টোই তাঁর ছিল। তিনি ফিনিক্সের মতো বাংলাদেশের পুনরুত্থানের কল্পনা করেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে পুরোপুরি বিধ্বস্ত বাংলার উন্নতির শীর্ষে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এই উঠে দাঁড়ানোর স্বপ্ন সম্পূর্ণ সূচিত হয়েছিল যখন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসে রেসকোর্সে ৩৫ মিনিটের অলিখিত স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণ দিলেন। ঐ ভাষণেই 'সোনার বাংলা' গড়ার কথা স্পষ্ট উঠে এল। 'সোনার বাংলা' – বাংলার মানুষের ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একটি স্বপ্নদর্শন । সেখানে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন, প্রথমত, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন। তারপরে বলেছিলেন বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বসবাস করবে, খেয়ে পড়ে সুখে থাকবে । বেকার যুবক যদি চাকরি না পায়, মানুষ যদি খেতে না পায়, এই স্বাধীনতা মিথ্যে হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে মুক্তির কথা বলেছিলেন ৭ মার্চে, সেই মুক্তির কথা আবার বললেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন রচিত হয়েছিল, তার নির্দেশনা এল এমন কথায় 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে; যা কোন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে না। বাংলাদেশের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র।'১৯৭২ সালের যে সংবিধান, যা কিনা বঙ্গবন্ধুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান, সেখানে জাতীয়তাবাদ সংযুক্ত করে চারটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫, বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্ন রূপায়নের জন্য সময় পেয়েছিলেন ১৩১৪ দিন। এই সময়ের মধ্যে তার কাজটি কত জটিল, কঠিন ছিল, দারুণ বৈরী পরিবেশের মধ্যে তার সূচক হছে ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের মন্তব্য 'বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি হবে'। এই অভিসম্পাত নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু ১৯৭২ এর জুলাই-আগস্ট মাসেই সেই তলাবিহীন ঝুড়িতে তলা লেগেছিল, ঝুড়িতে বেশকিছু জমা পড়েছিল। ততদিনে বিশ্বের ৮৬টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখন ছিল ৭.৪ শতাংশ।

১৯৭৫ এর ২৫ জানুয়ারী থেকে আরেকটি পর্ব শুরু হয়েছিল যাকে বলি 'বাকশাল পর্ব'। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) কোন একটি বিশেষ দল ছিল না। পরিস্থিতির অনিবার্যতায় একটি অভিন্ন জাতীয় মঞ্চ তৈরি হয়েছিল সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে। 'বাকশাল' স্বপ্নটির মধ্যে সারা বাংলাদেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপরেখা ছিল। সর্বসাকুল্যে ২৩৩ দিন প্রস্তুতিমূলকভাবে কার্যকর ছিল বাকশাল। সেই সময়ের মধ্য যত তথ্য-উপাত্ত আমরা পাই তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশের সব সুচকের ঊর্ধ্বগতি ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সেই স্বপ্নটির রূপায়নের সুযোগ দেয়া হোল না। বাংলাদেশ একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে ছিল। তথ্য-উপাত্ত তাই বলে। ঔপনিবেশিক আমলের সব ঐতিহ্য ঝেড়ে মুছে দিয়ে নবযাত্রার সূচনা হবে – এই ছিল বাকশাল প্রতিষ্ঠার মূলকথা। বঙ্গবন্ধু একটি গান গাইতেন 'মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল।' বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন তাঁর সাধ মিটে গেছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তার আশা তো পূরণ হয়নি। বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি, হতে পারল না।

সম্মোহনী নেতা বঙ্গবন্ধু

১৯৬৬ তে ৬ দফা আন্দোলন সূচিত হবার পর সিরাজুল আলম খান, (ছাত্রলীগের অগ্রগণ্য একজন নেতা এবং একটি যুব ফ্রন্ট 'নিউক্লিয়াস'-এর প্রধান, যা স্বাধীনতার জন্য গোপনে কাজ করছিল), মন্তব্য করেছিলেন যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে। কারণ লোকে তাঁর কথা শোনে। এই হোল সম্মোহন। বাঙালির অনেক নেতা আছেন, ছিলেন মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সবাই জননন্দিত রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো করে কেউ সাধারণ মানুষকে এত কাছে টানতে পারেননি, কেউ মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি। তিনি তাঁর বক্তৃতা-দক্ষতা দিয়ে জন মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন - যা একটি সম্মোহনী বৈশিষ্ট্য।

বঙ্গবন্ধুর সম্মোহন করার ক্ষমতা তো একদিনের গড়ে উঠার বিষয় নয়, ক্রমাগতভাবে গড়ে উঠেছিল। মানুষকে আকর্ষণ করার এই শক্তি, মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট হবার শক্তি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রচারণা চালানোর কাজে শেখ মুজিব যখন পায়ে হেটে টুঙ্গিপাড়ায় প্রচারণা চালাচ্ছিলেন, তখন এক বৃদ্ধা তাঁকে দোয়া করে বলেছিলেন, "গরীবের দোয়া তোমার জন্য সব সময় আছে"। সারা জীবন এই মানুষটি শোষিত বঞ্চিত মানুষের হয়ে রাজনীতি করেছেন। শুধু বাংলাদেশের না, সারা বিশ্বের। বঙ্গবন্ধুর তখন বয়স ছিল ২৯। তিনি তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "যখন আমি ঐ বৃদ্ধার কুঁড়েঘর ছেড়ে আসলাম, তখন

আমার চোখে পানি এসে গেছে। সেইদিন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম নিজের কাছে যে, কোনদিন মানুষের সাথে প্রতারণা করবো না"।[৬] করেনওনি কখনও। ইংরেজ সাংবাদিক David Frost ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২, তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "আপনার যোগ্যতা কী"? বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি মানুষকে ভালবাসি"। "আপনার দুর্বলতা কী?" বঙ্গবন্ধু বললেন "আমি তাদেরকে বেশি ভালোবাসি"। সে বছরেরই ২৩শে সেপ্টেম্বর, অ্যামেরিকার NBC চ্যানেলের সাংবাদিক পল নিক্সনকে বলেছিলেন, "আমি কোটি কোটি মানুষের ভালবাসা, আস্থা ও বিশ্বাস পেয়েছি। তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারলেও আমি নিজেকে সার্থক মনে করব"। বঙ্গবন্ধু তাঁর সারা জীবনে এই বিশ্বাসই লালন করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনের চূড়ান্ত মুহূর্তটি ছিল ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯। যখন রেসকোর্সে নাগরিক সংবর্ধনায় তৎকালীন ডাকসু ভি.পি তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবনায় জনতা হাত তুলে সমর্থন জানাল যে, শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু'। সেই থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু। জনগণের দেয়া উপাধি, এটি আরোপিত নয়।

১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি যা করতে বলেছেন, আর যা করতে নিষেধ করেছেন সেভাবেই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। সেইজন্যই, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণের শুরুতেই বলেছিলেন যে, 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, মানুষের অধিকার চাই'। তিনি লোকরঞ্জক নেতা ছিলেন না, তাঁর রাজনীতি ছিল মানুষলগ্ন। তিনি লোকানুবর্তি (populist) নেতা ছিলেন না। জনগণের স্বপ্ন নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে, জনগণ এবং নিজেকে সমন্বিত করে স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কাজেই তার লোকানুবর্তিতা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যে ভাবে ব্যবহার হয়, সেই পরিধির বাইরে গিয়ে ভাবা প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনের আরেকটি অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। আমরা সবাই জানি যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল নয় মাস। কিন্তু অনুপুঙ্খ হিসাব করে পাওয়া যায় আট মাস একুশ দিন। পৃথিবীর ইতিহাসে সংক্ষিপ্ততম মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের। এতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ইতিহাস স্বীকৃত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারি যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন তখন লন্ডনের 'The Guardian' পত্রিকায় প্রথম পাতায় শীর্ষ খবরে বলা হোল, " As soon as Sheikh Mujib walks out of the Dhaka airport the republic of Bangladesh becomes a reality." সত্যি

৬ Sheikh Mujibur Rahman, The Unfinished Memoirs *(Dhaka: The University Press Limited, 2016) p:260*

তাই হয়েছিল। ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে বাংলাদেশ যেন অসমাপ্ত, অপরিপূর্ণ বাংলাদেশ ছিল। বাংলাদেশ পরিপূর্ণ হোল ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ।

কেবলমাত্র দেশের মানুষের কাছেই তিনি সম্মোহনী নেতা ছিলেন না, বিদেশী নেতারাও তার সম্মোহন ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৭১-এ ঢাকায় কর্মরত আমেরিকার কন্সাল জেনারেল Archer K. Blood, তাঁর লেখা বই The Cruel Birth of Bangladesh: Memories of an American Diplomat-এ উল্লেখ করেছেন,

> "Mujib's very appearance suggested raw power, a power drawn from the masses and from his strong personality. He was taller and broader than most Bengalis, with ruggedly handsome features and intense eyes. A no-nonsense moustache gave added strength to his face, as did the heavy rimmed dark glases he invariably wore... his dress was that of a native politician."

অধিকন্তু, আমেরিকার *'The Newsweek'* পত্রিকায় ৫ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রকাশিত সংবাদে বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যে আমেরিকা বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে ছিল, সেই আমেরিকার পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলা হয়। এটি অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর সম্মোহন তার নিজের দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রমাণ। লক্ষ্যণীয়, সকল দেশের, সকল বয়সের, সকল রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র বঙ্গবন্ধুকেই তিনি এই উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়-

> "Tall for a Bengali (he stands 5 feet 11 inches), with a stock of graying hair, a bushy mustache and alert black eyes, Mujib can attract a crowd of a million people to his rallies and hold them spellbound with great rolling waves of emotional rhetoric. " Even when you are talking alone with him," says a diplomat, he talks like he's addressing 60,000 people," Eloquent in Urdu, Bengali and English, three languages of Pakistan, Mujib does not pretend to be an original thinker, he is a poet of politics, not an engineer, but the Bengalis tend to be more artistic than technical, anyhow, and so his style may be just what was needed to unite all the classes and ideologies of the region."

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যোগ দিয়েছিলেন।[৯] সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, সেখানে বঙ্গবন্ধু বললেন "বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত- শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে"। সম্মেলনে উপস্থিত কিউবার বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রো দৌঁড়ে এসে শেখ মুজিবকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মুজিব, এটি আমারও সংগ্রাম"। একই সম্মেলনে ক্যাস্ত্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে তিনি হিমালয়ের মতো। কাজেই আমার হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে।" একই সম্মেলন চলাকালিন সময়ে এক অবকাশে বঙ্গবন্ধু ও লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার আল গাদ্দাফির ৩৫ মিনিটের আলোচনা হয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ বিরোধী গাদ্দাফি দুই হাত তুলে বাংলাদেশের জন্য মোনাজাত করেন। ধারণা হয়, বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী রসায়ন গাদ্দাফির বাংলাদেশ বৈরী মানসিকতা পরিবর্তন করেছিল।

১৯৭৩-এর আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের সময়ে আরবদের জন্য বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন ও সহমর্মিতা মুসলিম দুনিয়ায় ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছিল। সুতরাং একজন আরব সাংবাদিক বাংলাদেশের সাংবাদিককে বলেছিলেন, "তোমাদের প্রধানমন্ত্রী [বঙ্গবন্ধু] একটি বড় যুদ্ধে একটি মাত্র গুলি না ছুঁড়েও অর্ধেক আফ্রিকাসহ আরব বিশ্ব জয় করে নিয়েছেন।"

সমাপনী বক্তব্য

বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নচারী ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়; স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর স্বপ্নের সমান। স্বপ্নের দ্বিতীয় পর্ব ছিল স্বাধীন বাংলাদেশকে সোনার বাংলা করা; যা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত জীবনের মতোই অসমাপ্ত থেকে যায়। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহন তাকে প্রিয় করেছিল শুধু দেশের মানুষের কাছেই নয়; সারা বিশ্বের গুণীজনও তাঁর প্রতি আকর্ষিত ও শ্রদ্ধাবনত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে জার্মান নেতা হিন্ডেনবুর্গ (জার্মান প্রেসিডেন্ট ১৯২৫-৩৪) সম্পর্কে চার্চিল যা বলেছিলেন, তা উদ্ধৃত করা যায় বঙ্গবন্ধুর ওপর এ আলোচনার শেষে:

> Hindenburg! The name itself is massive. It harmonizes with the tall, thick-set personage with beetling brows, strong features, and heavy jowl, familiar to the modern world. It is a face that you could magnify tenfold, a hundredfold, a thousand-fold, and it would gain in dignity, nay even in majesty; a face most impressive when gigantic.

গ্রন্থপঞ্জি

১ Gary Wills (1994), "What Makes a Good Leader" *The Atlantic Monthly.*

২ Jia Lin in commentary on Sun Tzu, *The Art of War: Complete Texts and Commentaries*, 2003, P.44 translated by Thomas Cleary

৩ This statement was secretly recorded by the Pakistan Military Intelligence, which Yahya Khan listened to and commented, "If Mujib betrays me I will fix him". History bears that Mujib did betray, but Yahya failed to fix him; and Mujib's betrayal culminated in the independence of Bangladesh.

৪ Andrew Newberg and Robert Waldman, *Words Can Change Your Brain* (Pennsylvania: Avery, 2012)

৫ Sheikh Mujibur Rahman, *The Unfinished Memoirs* (Dhaka: The University Press Limited, 2016, p:260)

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও দর্শন

আতিউর রহমান [৭]

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা বুঝতে হলে বাংলাদেশ নামের এই রাষ্ট্র গঠনে তাঁর মনোজগত গঠনের প্রক্রিয়াটি বোঝা জরুরি। তিনি একদিনেই একটি 'নেশন' গড়ে তোলার অভিপ্রায় আয়ত্ত করেননি। তিলে তিলে তিনি নিজে গড়ে উঠেছেন এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে তাঁর অন্তরে থিতু করেছেন। "নেশন একটি সজিব সত্তা, একটি মানস পদার্থ" বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নেশন কী' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ('রবীন্দ্র রচনাবলী' দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, অগ্রাহায়ন ১৩৯৩, পৃ. ৬২১)। তিনি দাবি করেছেন দুটো জিনিস মিলে এই পদার্থ গঠন করে থাকে। বস্তুত এ দুটো জিনিস একই। এরা পরস্পর সংযুক্ত। একটি অতীতে অবস্থিত, আরেকটি বর্তমানে। তিনি আরও বিস্তারিত লিখেছেন, "একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা, যে অখন্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাদের উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিত মত নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগের স্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। ... ... অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা- এগুলিই আসল জিনিস ...। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।" (ঐ, পৃ. ৬২১)। ঠিক যেমন বন্ধন বাঙালি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে। আর এই হিরণ্ময় সময়ের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

রবীন্দ্রনাথের এই 'নেশন ভাবনা' বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রভাবনার বেশ কাছাকাছিই মনে হয়। 'সাধারণের কল্যাণভার' যেখানে পুঞ্জিভূত তার সন্ধান তিনিও করে গেছেন আজীবন। সেখানেই যে দেশের মর্মস্থান তা বুঝতে বঙ্গবন্ধুর অসুবিধে হয়নি। তাই আমরা লক্ষ্য করি তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচায়' একদিকে সাধারণের দুঃখে তিনি ভারাক্রান্ত হন, অন্যদিকে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ঐ চরম মূহুর্তেও সমৃদ্ধ বাংলার স্মৃতি রোমন্থন করেন ('অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, নবম মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ. ১৮)। অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বেড়ে উঠেছে নানা ঘাত প্রতিঘাতে। বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে জেলে কাটাতে হয়েছে। দুঃখের সাথে বসবাস করতে করতেই এই বাংলাদেশের মানুষের সাথে তাঁর

৭ বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বন্ধনকে তিনি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছিলেন তিনি 'দিঘল পুরুষ'। হাত বাড়ালেই ধরে ফেলতেন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই চিরপরিচিত ভূখন্ড। "তাঁর দেশপ্রেশ ছিল প্রশ্নাতীত, তিনি ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। তাঁর জাগতিক অস্তিত্বই ছিল স্বাধীনতার অনন্ত ঘোষণা।" (নির্মলেন্দু গুণ)। দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনের প্রত্যয় নিয়েই তিনি বেড়ে উঠেছেন। আর তাদের জন্য লড়াই করেই অর্জন করেছেন বাংলাদেশ। তাঁর দুঃখী মানুষের জন্য সোনার বাংলা গড়বেন বলে বুনে গেছেন আশার স্বপন। আর সে কারণেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূলে রয়েছেন মানুষ। সাধারণ মানুষ। পরিশ্রমী মানুষ। তাদের কল্যাণে নিরন্তর নিবেদিত বঙ্গবন্ধুর গভীর সেই স্বপ্নের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন ভাষণে, বাহত্তরের সংবিধানে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার, কুদরত-ই-খুদা কমিশন প্রতিবেদনে এবং তাঁর লেখা আত্মজৈবনিক বইগুলোতে। এমন কি তাঁর শত্রু পক্ষ পাকিস্তানী রাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে তাঁর গণমানুষের কল্যাণ ভাবনার নানা দিক। আজ সারা বিশ্ব নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও যখন লক্ষ করে যে আর্থ-সামাজিক সূচক সমূহে বাংলাদেশ উঠে এসেছে ভিন্ন এক উচ্চতায় তখন আমরা জাতির পিতার প্রতি আমাদের অশেষ ঋণের কথা স্মরণ করি। দেশটি স্বাধীন না হলে কি আমরা এই বাংলাদেশ নিয়ে এমন করে গর্বিত হতে পারতাম। তাঁর দেয়া লড়াকু মনই যে আমাদের বিস্ময়কর রূপান্তরের সবচেয়ে বড় পুঁজি। আর কৃতজ্ঞ লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যাদের রক্তে ঘামে এবং ত্যাগে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের অস্তিত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী আমাদের দ্বারপ্রান্তে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা স্মরণ করতে চাই কেমন রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিলেন আমাদের জাতির পিতা।

শুরুতেই বলতে চাই বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশের কাদা-মাটি থেকে উঠে আসা এক অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক। তিনি এ দেশকে নিরন্তর জানতে চেষ্টা করতেন। আর মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। তিনি করে করে শেখা মানুষ। তাই এদেশের জন্য স্বতন্ত্র উন্নয়ন কৌশল খুঁজে নিতে তাঁর অসুবিধে হয় নি। ৭ জুন ১৯৭২। সোহরাওয়ার্দী ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তিনি তাঁর স্বদেশী সমাজ ও অর্থনীতি গড়ার স্বপ্ন মেলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি বিশ্বের কাছ থেকে সমাজতন্ত্র ধার করতে চাই না। বাংলার মাটিতে এই সমাজতন্ত্র হবে বাংলাদেশের মানুষের। এই সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মানুষের যেখানে কোন শোষণ এবং সম্পদের বৈষম্য থাকবে না। ধনীকে আমি আর ধনী হতে দিবনা। কৃষকেরা, শ্রমিকেরা এবং জ্ঞানীরা হবে এই সমাজতন্ত্রের সুবিধাভোগী।" তাঁর এই গণহিতৈষী ভাবনার মূলে ছিল সমাজ থেকে সব ধরনের বৈষম্য দূর করা। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন মনে প্রাণে গণতান্ত্রিক। অন্যের মতামতকে তিনি সর্বদাই যুক্তি দিয়ে বিচার করতেন এবং গ্রহণ করতেন। আর ছিলেন উদার, আধুনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ। তাই তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানের চারটি মূলস্তম্ভে আমরা আধুনিক সব রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন

দেখতে পাই। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূলকথাই ছিল:

১. জাতীয়তাবাদ- বাঙালির নিজস্ব পরিচয় ও আত্মসম্মানের নিশ্চয়তা

২. সমাজতন্ত্র- নিজস্ব বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন।

৩. গণতন্ত্র- জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা চালু করা।

৪. ধর্ম-নিরপেক্ষতা- সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা।

এই সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে তাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে সকল নাগরিকের জন্য সমতা সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থানের মত মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে এই সুযোগের অঙ্গীকার করা হয়েছে। সংবিধানে শোষণহীন, সহিষ্ণু সমাজ গঠনের এই দায়বোধ একদিনেই তৈরি হয়নি তাঁর মনে। বাল্যকাল থেকেই তিনি এদেশের মাটি ও মানুষের খুব কাছে থাকার চেষ্টা করেছেন। সে সময় থেকেই তাঁর মধ্যে এক ধরনের সাংগঠনিক দক্ষতা গড়ে উঠেছিল, যা তিনি পরবর্তী সময়ে কাজে লাগিয়েছেন বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি তাঁর গৃহশিক্ষক কাজী আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন 'মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন'। গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা সম্পন্ন পরিবার থেকে 'মুষ্টি চাল' তুলতেন। তাদের থাকার জন্য 'জায়গির'-এর ব্যবস্থা করে দিতেন। শিক্ষক আব্দুল হামিদের কাছ থেকেই তিনি শুনেছেন সূর্য সেন, সুভাষ বসু ও গান্ধীর সমাজ বদলের সংগ্রামের কাহিনী। এসবই তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। সাধারণ মানুষের জন্য কিছু একটা করার অনুপ্রেরণা তিনি তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে মৃতপ্রায় মানুষের জন্য লঙ্গরখানা পরিচালনা করেছেন। দেশবিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণ-শিবির পরিচালনা করেছেন। যাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই, তাদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই তরুণ মুজিব রাজনীতিতে যোগ দেন। আর আজীবন তিনি জনমানুষের রাজনীতিতেই নিমগ্ন ছিলেন। বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় করার লড়াইই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল কথা। শাসক শ্রেণী জনগণের ন্যায্য দাবি মানতে অস্বীকার করলেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অন্দোলন গড়ে তুলতেন। বঞ্চিতজনদের সঙ্গে নিয়েই সমাবেশ করতেন। কৃষকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার জন্য তাই প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'দাওয়াল'দের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর রাজনৈতিক আন্দোলন যখন নস্যাৎ করা হয়েছে তখন তিনি বেছে নিয়েছেন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পথ। তবে তার আগে তিনি বিরোধী পক্ষের সাথে দীর্ঘ আলাপ-

আলোচনাও করেছেন। সেই আলোচনা ব্যর্থ হলেই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। তার আগে তিনি জনগণকে সচেতন করেছেন এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। মুক্তির এই ডাকের ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করেছেন তাঁর দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে।

পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন পূর্ব-বাংলার কৃষক, প্রজা, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক মুক্তির আশায়। জমিদারি প্রথা উঠে যাবে। কৃষক জমির মালিক হবেন। তাদের সন্তানেরা শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ পাবে। তাদের খাদ্য সংকট থাকবে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। এমনটিই তাঁর প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের কাংঙ্খিত সেই পাকিস্তান অর্জিত হয়নি। সে ছিল এক ভ্রান্ত প্রত্যুষ। পাকিস্তানের ধনীক-আমলা-স্বার্থান্বেষী মহল তাদের স্বার্থ হাসিলের রাষ্ট্র গঠন করে পাকিস্তানের নামে। ঐ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যই ছিল দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বাড়িয়ে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর হাতকে আরও শক্তিশালী করা। তাই শেখ মুজিব তাঁর সহযোগী ও তরুণদের সংগঠিত করতে নেমে পড়েন। কলকাতা থেকে ঢাকা আসার পরপরই। প্রথমে গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তারপর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং সবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ার কাজে নেতৃত্ব দেন। ইতোমধ্যে বাংলা ভাষার মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে তৎপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা হিসেবে এই আন্দোলনে যুক্ত থাকা অবস্থাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বহিষ্কার করে। তিনি দুই আন্দোলনই চালিয়ে যান। ফলে তাঁকে একাধিকবার জেলে যেতে হয়। জেলে থাকা অবস্থাতেই আসে একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। জেলে থেকেই এই আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে আমরণ অনশন শুরু করেন। তারও আগে জেলে থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক অসুস্থ হয়ে পড়ায় জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সম্ভাবনাময় বিরোধী দলটির গণসম্পৃক্তির বিস্তৃতি ঘটান।

আসে চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। নির্বাচিত হয়ে মাত্র কয়েকদিনের জন্য মন্ত্রী হয়েছিলেন শেরেবাংলার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভায়। এর পর শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এ সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। ঐ সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র শেখ মুজিবকেই জেলে পাঠানো হয়। কেননা শত্রুরা ঠিকই বুঝেছিলো যে তিনিই হতে যাচ্ছেন বঞ্চিত বাঙালির প্রতিরোধের প্রতীক। গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলো সেই কথাই বলে। জেল থেকে মুক্তি পেয়েই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দলকে সুসংগঠিত করতে থাকেন। মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগকে মূলধারার বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে চাঙ্গা করে তোলেন। গণপরিষদের সদস্য হন। আবার মন্ত্রী হন। পরে অবশ্য দল ও বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বকেই বেছে

নেন। আসে সামরিক শাসন। অবধারিত ভাবেই তিনি গ্রেফতার হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মাঝে যে বৈষম্য দানা বেঁধে উঠেছে তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৯৫০ এর দশকের শেষ দিকেই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পনেরশো মাইলের ব্যবধান একটি ভৌগলিক বাস্তবতা। কাজেই এই দুই ভূখন্ডের জন্য আলাদা অর্থনীতি গঠনের কোনো বিকল্প নেই।" কেননা, দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য শুধুই বাড়ছিল। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৯-৬০ সময়কালে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেকার বৈষম্য ছিল নিম্নরূপ:

পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোট রাজস্বের ৬০% এলেও এখানে ব্যয় হতো তার ২৫%।

- রপ্তানী আয়ের ৫৯% পূর্ব পাকিস্তান থেকে এলেও মোট আমদানীর ৩০% হতো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।
- পশ্চিমের মাথা পিছু উন্নয়ন ব্যয় ছিলো পূর্বের চেয়ে ৩.৫ থেকে ৫ গুণ বেশি।
- বৈদেশিক সহায়তার মাত্র ৪% পেতো পূর্ব পাকিস্তান।
- জন প্রশাসনের মাত্র ১৫% পদে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা।
- সশস্ত্র বাহিনীর মোট জনবলের মাত্র ৫% ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। (১৬ জন জেনারেলের মধ্যে ১জন)

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় এক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ছয়-দফা ঘোষণা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিকরা এই ঘোষণা ভালোভাবে না নিলেও পূর্ব-বাংলার মানুষ তা লুফে নেন। এই ছয় দফায় মূল কথাগুলো ছিল: ১) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, ২) প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতায়ন, ৩) অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন, ৪) কর আহরণে প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব, ৫) আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাবস্থাপনা, এবং ৬) নিজস্ব মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী। ঘোষণা দিয়েই তিনি বসে রইলেন না। দলের কার্যকরী সভায় তা পাস করালেন। তরুণদের কাছে এর ব্যাখ্যা তুলে ধরলেন। পূর্ব বাংলার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাঁর এই ছয়-দফার সমর্থনে। তাই তাঁকে জেলে যেতে হলো বারে বারে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত করে জীবনের তরে শেষ করতে চাইলো পাকিস্তানী শাসক চক্র। ঊনসত্তরের অসাধারণ অভ্যুত্থানের কারণে তিনি মুক্ত হলেন। ছাত্র-জনতা তাঁকে ভালোবেসে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিলেন। কিছুদিন পরেই আইয়ুব সরকারের পতন হয়। ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। তিনি সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। বঙ্গবন্ধু এ নির্বাচনকে ছয়-দফার পক্ষে রায়ের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?'- এই আওয়াজ তুলে তিনি শুরু করলেন

ছয়-দফাভিত্তিক ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার অভিযান। নির্বাচনের প্রাক্কালে ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ তারিখে তিনি যে বেতার টেলিভিশনে ভাষণ দেন তাতে ছয় দফার পরিপ্রেক্ষিত এভাবে ব্যাখ্যা করলেন: "যে সঙ্কট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে তার প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয় কারণ, জনগণের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয় কারণ অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের জন্য সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত এগুলোই বাঙালির ক্ষোভ-অসন্তোষের কারণ।"

ডিসেম্বরে হলো নির্বাচন। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে ছয়-দফাভিত্তিক সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করলেন। অন্য দিকে ভুট্টোর নেতৃত্বে দানা বাঁধলো ষড়যন্ত্র। পাকিস্তানি অভিজন শাসকশ্রেণী তাদের ক্ষমতা কিছুতেই ছাড়বে না। ঘোষিত জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশন ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে হঠাৎ করেই স্থগিত ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগের সময়টায় তিনি কার্যত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশাসন কিভাবে চালাতে হয় তা দেখিয়ে দিলেন। এখানেও তিনি সামাজিক পিরামিডের নীচের দিকের মানুষগুলোর জন্য বিশেষ ছাড় দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনে তাদের রুটিরুজির যেন অসুবিধে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ম নজর রেখেছিলেন। ৭ মার্চ তিনি দিলেন মুক্তির চূড়ান্ত ডাক। রাজনৈতিক সংগ্রামকে সশস্ত্র যুদ্ধে রূপান্তরের কোনো বিকল্প তাঁর হাতে ছিলো না। ২৫ মার্চ পাকিস্তনী সশস্ত্রবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে তার খানিক বাদেই ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। তিনি বন্দী হলেন। তবুও তিনিই এই পর্বের প্রধান নেতা। তাঁর বজ্রকণ্ঠই হলো মুক্তিযোদ্ধাদের বড় অবলম্বন। নয় মাসের সর্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ শেষে অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করলো। অবশেষে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। শুরু হলো আধুনিক গণমুখী এক নয়া রাষ্ট্র বিনির্মাণের সংগ্রাম। যে রাষ্ট্র ন্যায়ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গণমুখী।

বঙ্গবন্ধু ছয়-দফা প্রচারের সময় একটি পোস্টার বিতরণ করেছিলেন। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শিরোনামের সেই পোস্টারটি বাঙালির হৃদয় কেড়েছিল। শিল্পী হাশেম খান এঁকেছিলেন এটি। সেটি ছিল প্রতীকি শ্মশান। কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশের পরিচালনার ভার যখন তিনি নিলেন তখন সত্যি সত্যি বাংলাদেশ এক ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। সেই শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন তিনি স্বদেশবাসীকে দেখিয়েছিলেন তা থেকেই অনুমান করা যায় কেমন রাষ্ট্র বিনির্মাণের কথা তিনি মনে মনে ভাবছিলেন। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলায় আগামীদিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত

সমাজ গড়ে তুলবো। ক্ষেত-খামার, কলকারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়ে যান। আসুন সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসবে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।"

এই ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়ানো মোটেও সহজ ছিল না। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ৮ বিলিয়ন ডলার। এই জিডিপির মাত্র তিন শতাংশ ছিল সঞ্চয়। বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত ছিল ৯ শতাংশ। এই ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় বাংলাদেশকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে সেসবের কয়েকটি উল্লেখ করছি:

- যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অবকাঠামো তৈরি করতে হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে।
- ১ কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করতে হয়েছে, দেশের ভেতর ২০ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছে।
- সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য তৈরি করতে হয়েছে জন-বান্ধব গণতান্ত্রিক সংবিধান।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দাঁড় করাতে হয়েছে উন্নয়নের রূপরেখা।
- এসবই করতে হয়েছে প্রতিকূল প্রকৃতি এবং বিরূপ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে।

এই সময়টায় যুক্তরাষ্ট্র সোনা ও ডলারের বিদ্যমান সমীকরণ থেকে সরে দাঁড়াল। হঠাৎ ব্যারেল প্রতি তেলের দাম তিন ডলার থেকে এগার ডলার হয়ে গেল। টন প্রতি ৮০ ডলারের গমের দাম ২৪০ ডলার হয়ে গেল। ৮০ ডলারের প্রতিটন সারের দাম বেড়ে দাঁড়ালো ২০০ ডলারে। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো এর পুরো ফায়দা তুললো। মূল্যস্ফীতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করলো। বন্যায় পর পর দুবার ফসলের ক্ষতি হয়ে গেল। খাদ্য সাহায্য নিয়ে চললো কূটনৈতিক অনাচার। অনেক কষ্টে তিনি দুর্ভিক্ষ সামলালেন। মূল্যস্ফীতি ৬৫% থেকে কমে ৩০% নেমে এলো। ফসল উৎপাদন বাড়াতে তিনি নানা ধরনের প্রণোদনা দিলেন। ধীরে ধীরে অর্থনীতি সুস্থির হতে শুরু করেছিল।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকবেলার জন্য বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বে খুব দ্রুতই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী তৈরি করা হয়। ঐ সুচিন্তিতভাবে তৈরি করা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক নয়া অভিযাত্রার সূচনা করা হয়। লক্ষ্য ছিল: ১) কৃষি ও শিল্পের পুনঃগঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসন, ২) প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫% উন্নীতকরণ, ৩) নিত্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ৪) আমদানী নির্ভরতা কমাতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি। রপ্তানী

বাড়ানো। উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে যে তিনি কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সঠিকভাবেই আশা করেছিলেন যে কৃষি দেশের বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠির খাদ্যের জোগান দেবে। কৃষিখাতেই সদ্য স্বাধীন দেশের শ্রমশক্তির বড় অংশ যুক্ত থাকবে। আর কৃষি থেকে আসবে শিল্পের কাঁচামাল এবং শিল্প পণ্যের চাহিদা। তাই কৃষি রক্ষা ও বিকাশে বঙ্গবন্ধু দ্রুত কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল- কৃষি অবকাঠামো দ্রুত পুনঃনির্মাণ, মানসম্পন্ন বীজের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, অন্যান্য কৃষি উপকরণও বিনামূল্যে অথবা ভর্তুকিতে সরবরাহ করা, কৃষকদের বিরুদ্ধে করা এক লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার। এছাড়াও প্রান্তিক কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য রেশন সুবিধাও চালু করেছিলেন।

একই সঙ্গে মানুষকে কঠোর পরিশ্রমের আহব্বান জানিয়েছিলেন। যে কোনো মূল্যে তিনি উৎপাদন বাড়ানোর পক্ষে ছিলেন। বলেছিলেন- "ভাইয়েরা আমার, পরিশ্রম না করলে, কঠোর পরিশ্রম না করলে সাড়ে ৭ কোটি লোকের ৫৪ হাজার বর্গমাইল এলাকার এই দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়সা করতে হবে। শ্রমিক ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ। তোমাদের বারবার বলছি এখনো বলছি, প্রোডাকশন বাড়াও"।

শুধু কৃষি কেন, নতুন দেশে শিল্পোন্নয়নও ছিল এক অভাবনীয় চ্যালেঞ্জ। কেননা- তখন বিদেশী মুদ্রা বা বিদেশী বিনিয়োগ বলতে কিছুই ছিলো না। আর ফরওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ছিলো অতি সামান্য। তারচেয়েও বড় কথা দেশীয় উদ্যোক্তা শ্রেণী ছিলো প্রায় অনুপস্থিত। সেজন্যে তিনি বাস্তবভিত্তিক এক শিল্পনীতি গ্রহণ করেন। পাকিস্তানী উদ্যোক্তাদের ফেলে যাওয়া উদ্যোগগুলো দ্রুত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে শিল্প উৎপাদনের চাকা সচল রাখলেন। ব্যাংক, বীমা, পাটকল, চিনিকল, টেক্সটাইল মিল ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়করণ করলেন। আর এই নীতির সুফলও দেশ পেয়েছিল। স্বাধীনতার প্রথম বছরেই শিল্পোৎপাদন অগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরে অবশ্যি অমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবের কারণে এই ধারা বেশি দিন ধরে রাখা যায় নি। সেজন্য বাস্তববাদী বঙ্গবন্ধু তাঁর শিল্পায়নের কৌশলকে পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শুরুতে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে শিল্পের ভিত্তি তৈরি করার পর তিনি ব্যক্তিখাতের কার্যকরী বিকাশের দিকে মনোযোগ দেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও ব্যক্তিখাতের বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টির প্রস্তাবনা ছিল। আর তাই ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরের বাজেটে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের সীমা ২৫ লক্ষ টাকা থেকে তিন কোটি টাকায় উন্নীত করা এবং ১৩৩টি পরিত্যক্ত কারখানার মালিকানা ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর করার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

তিনি শুরুতেই বলেছিলেন সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের জন্য শিক্ষার অপরিহার্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আর দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু গঠন করেছিলেন কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। একই সঙ্গে তিনি জানতেন গণমুখী জনপ্রশাসন ছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই মাঠ প্রশাসনকে দক্ষ করে গড়ে তোলায় অগ্রাধিকার দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি। একই সঙ্গে জেলা গভর্নর পদ সৃষ্টি করে তিনি প্রশাসনকে বিকেন্দ্রায়নের এক সুদূরপ্রসারি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় না নিতে পারলে মানুষ ভালো সেবা পাবেন না। প্রশাসনে দুর্নীতি কমানো এবং জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য তাই তিনি এমন সুদূর প্রসারি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেবার আইন জারি করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের খবরদারি নিরুৎসাহিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করেন। কৃষিকে গুরুত্ব দিতেন বলে কৃষি স্নাতকদের ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করেন। এসবই আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে উপযুক্ত শিক্ষার ভূমিকা বিষয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারি ভাবনার প্রতিফলন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতি ঠিকঠাক মতো বাস্তবায়নের পথে বঙ্গবন্ধু যথার্থই দুর্নীতিকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি এক ভাষণে বলেছিলেন, "করাপশন আমার বাংলার মজদুর করেনা। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ, যারা আজ ওদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করছি। আজ যেখানে যাবেন, করাপশন দেখবেন। আমাদের রাস্তা খুঁড়তে যান করাপশন, খাদ্য কিনতে যান করাপশন, জিনিস কিনতে যান করাপশন, বিদেশ গেলে টাকার উপর করাপশন। তারা কারা? আমরা যে পাঁচ পার্সেন্ট শিক্ষিত সমাজ, আর আমরাই বক্তৃতা করি। আজ অত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এসব চলতে পারেনা।"

বঙ্গবন্ধুর এই বাস্তবানুগ উন্নয়ন নীতি কৌশলের সুফল বাংলাদেশ ঠিকই পেতে শুরু করেছিল। মাত্র চার বছরের শাসনের মাথায় বাংলাদেশের নাগরিকদের মাথাপিছু আয় তিন গুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল (১৯৭২ সালের ৯৩ ডলারের মাথাপিছু আয় ১৯৭৫ সালে ২৭৩ ডলারে উন্নীত করা গিয়েছিল)। বঙ্গবন্ধু বরাবরই কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাক্তিখাতকে পৃষ্ঠপোষকতা দেবার পক্ষে ছিলেন। এই নীতি ১৯৯০ সালের এশীয় আর্থিক সংকট, ২০০৭-০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সংকট এবং ২০২০ সালের করোনা সংকটে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদেরই দুর্ভাগ্য তাঁর নেয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সুফল তিনি দেখে যেতে পারেননি। একদল ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতকদের অচমকা আঘাতে তাঁকে তাঁর প্রিয় স্বদেশবাসী থেকে শারিরিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। তাই প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা

করেও ব্যাপক খাদ্য উৎপাদনের সুফল তিনি দেখে যেতে পারেননি। দেশ ছিটকে পড়েছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রগতিশীল ধারা থেকে। তারপর বৈষম্য বেড়েছে। তৈরি হয়নি যথেষ্ট কর্মসংস্থান। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ভুক্তভোগী হয়েছেন দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ। তবে তিনি ছিলেন এবং এখন আছেন তাঁর প্রিয় স্বদেশবাসীর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে।

অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পর স্বদেশ ফিরেছে তাঁর দেখানো পথে বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধরে। আমরা আজ সকল প্রতিকূলতা ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে। বাংলাদেশ আজ দারিদ্র্য নিরসন, সামাজিক উন্নয়ন তথা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক রোল মডেল। এই করোনাকালেও তার 'উন্নয়নের অভিযাত্রা' থামেনি। জনপ্রশাসনকে ডিজিটাল করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তারা এখন জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে পারছেন। প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর হার ৩% থেকে ১৬% এ উন্নীত করা গেছে গত ৬-৭ বছরে। বঙ্গবন্ধু তাঁর শিক্ষাভাবনার প্রতিফলন দেখে যেতে পারেননি। তবে তাঁর ভাবনার আলোকেই আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে মানবসম্পদ উন্নয়নের তৎপরতা চলছে তাঁরই বাংলাদেশে। ডিজিটাল আর্থিক সেবা পৌঁছে গেছে গ্রামে-গঞ্জে, চরে-হাওরে। এই মহামারির সময় মোবাইল আর্থিক সেবার ব্যাপক প্রসারের কারণে গার্মেন্টস কর্মীরা নির্বিঘ্নে প্রণোদনা নির্ভর বেতন পেয়েছেন। লক-ডাউনের মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখা গেছে। প্রতি মাসে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার সম-পরিমাণ প্রবাসী আয় নিমিষেই ব্যাংক হিসেব, মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে। কোথাও তাই নেই তারল্য সংকট। গ্রাম বাংলার অর্থনীতি বেশ চাঙ্গা। ই-কমার্স, এফ-কমার্স দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। অসংখ্য নয়া উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সংকোচনের পরও ডিজিটাল বাংলাদেশে মানুষ মোটামুটিভাবে খেয়ে-পরে ভালোই আছেন। তার মানে এই নয় যে মানুষের সব চাওয়া মিটে গেছে। নিঃসন্দেহে এখনও অনেক চাওয়াই অপূর্ণ রয়ে গেছে। কিন্তু এই অপূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামও বসে নেই। নিরন্তর কাজ করে চলেছেন এদেশের পরিশ্রমী মানুষ, উদ্যোক্তা, অসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন। সকলে মিলেই আমরা এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। প্রান্তজনের সখা বঙ্গবন্ধু বরাবরই দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনের স্বপ্ন দেখতেন। তাই ০৯ মে ১৯৭২-এ বলেছিলেন, "আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক।"

তাঁর অন্তরের গহীনের সেই স্বপ্ন অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকন্যার ডিজিটাল বাংলাদেশ। যে আধুনিক, মানবিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার সুদূরপ্রসারি রাষ্ট্রচিন্তা

তিনি করতেন তা পূরণের পথেই হাঁটছে আজকের বাংলাদেশ। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এই বাংলাদেশ আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হোক, আরও জলবায়ু-বান্ধব সবুজ হোক সেই প্রত্যাশাই করছি তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর এই বছরে।

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

রফিকুল ইসলাম [৮]

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক ও ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রতিক্রিয়া: পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহম্মদ ঘোষণা দেন যে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। তাৎক্ষনিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকতা থেকে লিখিতভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং বলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা। একটি নিবন্ধে ড. শহীদুল্লাহ বলেন গণতন্ত্রের বিধি অনুসারে শতকরা ৫৫ জন নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করা ন্যায় সঙ্গত হবে। এরপর আমরা ভেবে দেখব যে, একই সঙ্গে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা যায় কিনা।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন:

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা দেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে ইংরেজী বা উর্দু। লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে বলেন উপমহাদেশের (ভারতের) ১০ কোটি মুসলমানের দাবির প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং এই ১০ কোটি মুসলমানের ভাষাই উর্দু সুতরাং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যাই ছিল আনুমানিক ৭ কোটি এর মধ্যে প্রায় ৪ কোটি মানুষের ভাষা ছিল বাংলা।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিবাদ ও প্রস্তাব:

পূর্ববাংলা থেকে গনপরিষদে নির্বাচিত কুমিল্লার কৃতি সন্তান ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে ইংরেজী বা বাংলা। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদে দাড়িয়ে বলেন পাকিস্তানের ছয় কোটি নব্বই লাখ লোকের মধ্যে ৪ কোটি লোক বাংলায় কথা বলে। সুতরাং দেশের অধিকাংশ লোক যে ভাষায় কথা বলে সেটিই রাষ্ট্রভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি গণপরিষদের ভাষা ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলার প্রস্তাব করেন। তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৫৫% হওয়া সত্বেও কন্ঠভোটে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্থাপিত প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

৮ জাতীয় অধ্যাপক

আন্দোলনের সুত্রপাত ও তরুন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভুমিকা:

গণপরিষদে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রত্যাখানের খবর আসলে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন শুরু হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। চারদিকে অন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ২রা মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এ সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, আনোয়ারা খাতুন, আবুল কাশেম, সরদার ফজলুল করিম প্রমুখ। এ সময় তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রলীগের নের্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় তরুণ যুবক শেখ মুজিবুর রহমানের নের্তৃত্ব অনেককে আকৃষ্ট করে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন এবং দেশব্যাপী ধর্মঘট আহবান করা হয়। ছাত্ররা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরের গুরুত্ব মানুষকে বোঝায় যদিও ঢাকার আদিবাসীরা এর বিরুদ্ধে ছিল। ১১ মার্চ প্রচন্ড বিক্ষোভ হয় এবং খাজা নাজিমউদ্দিনের বাসভবন বর্ধমান হাউস (বর্তমান বাংলা একাডেমি) ঘেরাও করে। বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে একদল ছাত্ররা সচিবালয় ঘেরাও করে এবং সামনে শুয়ে পড়ে। অরেকদল ছাত্র সচিবালয়ের পাশে দুই মন্ত্রীর বাসভবন (খাদ্যমন্ত্রী আফজাল ও শিক্ষামন্ত্রী হামিদ) ঘেরাও করে এবং তাদেরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। অন্দোলন দমনের অংশ হিসেবে পাকিস্তান সরকার লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু, অলি আহাদসহ অনেককে গ্রফতার করা হয় যদিও তারা ১৫ মার্চ মুক্তি পান। ১৫ তারিখ বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে পুকুরপাড়ে আবার সভা করেন এবং সভা শেষে শোভাযাত্রা করে এসেম্বলি ঘেরাও করেন। পরবর্তীতে বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে একদিন আইয়ুব খান (আয়ুব খানের বই ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স গ্রন্থ) খবর পেয়ে একজন মেজর পাঠিয়ে খাজা নাজিমউদ্দিনকে জগন্নাথ হলের বাবুর্চিখানার মধ্য দিয়ে থেকে উদ্ধার করে বর্ধমান হাউসে পৌঁছে দেন।

গভর্নর জেনারেলের পূর্ব বাংলা সফর:

১৯ মার্চ ১৯৪৮ গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলা সফর করেন এবং ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেন। এছাড়া ২৪ মার্চের কার্জন হলের সমাবর্তনেও ইংরেজী ভাষায় (ইংরেজী ভাষা ছিল তাঁর মাতৃভাষা) একই ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি পূর্ব বাংলার জনগণকে হিন্দু বলে তিরষ্কার করেন। জিন্নাহ বলেন যারা উর্দুর বিরোধিতা করবে তারা জনগণের শত্রু (Enemy of People and the State)। এই কথা বলার সাথে সাথে শেখ মুজিবসহ মতিন, আহসান প্রমূখ একদল ছাত্র দাড়িয়ে নো, নো বলে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানান এবং সভা থেকে বের হয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের (আবুল কাশেম, নজরুল ইসলাম, তোয়াহা প্রমুখ) সাথে বিকেলে বর্তমান সুগন্ধায় (পুরাতন গণভবন)

সাক্ষাৎ করতে বলেন যদিও ঐ সাক্ষাতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন না। প্রথমে ডাকসু ভিপি একজন হিন্দু দেখে তিনি সাক্ষাত দিবেন না বলে জানিয়ে নেন কিন্তু নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধির কথা বলায় তিনি রাজি হন। ঐ সভায় রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয় কিন্তু রাষ্ট্রভাষা উর্দুর ব্যাপারে তিনি অনড় থাকেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববাংলা সফর শেষে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরেই মারা যান আর পকিস্তানের নতুন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন উর্দুভাষী খাজা নাজিমউদ্দিন।

লিয়াকত আলী খানের ঢাকা সফর:

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলায় এসে ঘোষণা দেন যে উর্দু হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তিনি উর্দু ভাষার বিরোধীদের রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে কঠোর ভাবে দমনের কথা উল্লেখ করেন। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে লিয়াকত আলী খান আবার পূর্ববাংলা সফর করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তব্যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত পূনর্ব্যক্ত করেন। ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন পাকিস্তানের মানুষের ভাষা এবং মুসলমানের ভাষা হচ্ছে উর্দু তাই উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে ছাত্ররা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কথা উল্লেখ করে লিয়াকত আলী খানকে মানপত্র দেয়া হলে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন:

১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন পুরনো ঢাকার রোজ গার্ডেনে গোপন বৈঠকে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। সংগঠনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন শামসুল হক, যুগ্ম সম্পাদক হন শেখ মুজিবর রহমান ও সহসাধারণ সম্পাদক হন খন্দকার মেশতাক আহমদ। এ সংগঠনের কারণে পূর্ববাংলায় গণতন্ত্রের ব্যাপ্তি ঘটে এবং ভাষা আন্দোলন বেগবান হয়। অক্টোবর মাসে নিম্ন কর্মচারীদের (ভূখ) আন্দোলনে নেতৃত্বে দেয়ার কথিত অপরাধে ভাসানী ও শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ এই চার বছর পূর্ববঙ্গে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করে।

১৯৫১ সালের ৩ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় আততায়ীর গুলিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হন। তার নিহত হওয়ার সাথে সাথে খসড়া মূলনীতি আর

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন কিছুটি চাপা পড়ে কিন্তু ১৯৫২ সালে ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বর্ক্তৃতায় আবারো উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেন। শুরু হয় নতুন করে আন্দোলন।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন এবং অন্দোলন জোরদার:

১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকার মোক্তার বার লাইব্রেরীতে আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে গঠিত হয় "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ"। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিকালে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন নির্দিষ্ট ছিল। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ এই দিনকে ভাষা দিবস ঘোষণা করে এবং দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে। সরকার হঠাৎ করেই ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে বিরোধী দলগুলো বারবার মিটিং করেও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না। রাত ৮ টায় ৯৪ নবাবপুর রোডে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতে (জেলে ছিলেন) আওয়ামী মুসলিম লীগ আফিসে আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে ৩০ মিনিটের মত আলোচনা করে ''হরতাল প্রত্যাহার ও ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে না' মর্মে ভোট গ্রহণ করলে ১১-৪ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তাদের একটা ভয় ছিল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে গেলে আইন-শৃংখলা অবনতির অজুহাত দেখিয়ে আসন্ন পরিষদ নির্বাচন স্থগিত করা হবে।

২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র আন্দোলন:

নবাবপুর রোডের 'হরতাল প্রত্যাহার ও ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে না' সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পোঁছার সাথে সাথে ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। দেখা যায় এ সময় ছাত্রলীগের একাংশ ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অবশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে দোদুল্যমান ভাব দেখা দেয় কারণ ঐ সময় শেখ মুজিব জেলে ছিলেন এবং মাওলানা ভাসানী ঢাকায় ছিলেন না। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ১১ জন ছাত্র নেতা কর্তৃক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তই ভাষা আন্দোলনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। তারা রাতেই জেলে শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ দিন রাতে গাজীউল হক, মোহাম্মদ সুলতান, আব্দুল মমিন প্রমুখ সাত-আটজন ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে মিলিত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। ২১ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ১১ টায় গাজীউল হকের নের্তৃত্বে বিশাল সভা হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র ও সাধারণ জনতা ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাষার প্রতি মানুষের আবেগ এতই গভীর ছিল যে কোন একক নেতৃত্ব ছাড়াই এ আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুরের মধ্যেই হাজার হাজার ছাত্র জমায়েত হয় মেডিক্যাল হোস্টেল এলাকায়। বেলা তিনটায় প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। বেলা ২.৩০ নাগাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। দেখা গেল যতই গ্রেফতার করে ততই সংখ্যা বাড়তে থাকে। কোন রকম পূর্ব-সংকেত ছাড়াই হঠাৎ বেলা ৩.২০ মিনিটে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই ৩ জন নিহত ও অসংখ্য লোক আহত হন। চারদিকে চিৎকার আর পানির জন্য আর্তনাদ শোনা যায়। প্রথম মাথায় গুলিবিদ্ধ হন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমদ। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আবুল বরকতের লাশটি চিহ্নিত করা হয় । একে একে জব্বার ও সালাম (সালাম ছিলেন একটি প্রেসের কর্মচারী) সহ অনেকে নিহত হন। এ ভাষা আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছেন তার হিসেব নেই। রাস্তায় পড়ে থাকা অনেকের লাশ পুলিশ ট্রাকে করে নিয়ে যায়। রেডিও, রেলওয়ে, রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, দোকান-পাট সব বন্ধ থাকায় কোন তথ্য ঠিকমত সংগ্রহ করা যায়নি। গুলিবর্ষণের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে দাবানলের মত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের সামনে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, শেরেবংলা এ.কে ফজলুল হকসহ অনেকে এ জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। জানাজা পূর্ব জনসভায় সভাপতিত্ব করেন যুবনেতা ইমাদুল্লাহ লালাভাই। জানাজার পরেও ঢাকাসহ সারা দেশে প্রচন্ড বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে এবং এই সময় আবার গুলি শুরু হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন এর পত্রিকা 'সংবাদ' অফিস এবং পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক Morning News এর অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়।

মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দিন (এমএলএ) গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ব্যবস্থাপক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ছাত্রদের অনুরোধে আবুল কালাম শামসুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজের পার্শ্বে যেখানে গুলিবর্ষণ করা হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি সেখানে শহিদ মিনার স্থাপন করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে দলে দলে নারী-পুরুষ, বয়স্ক-শিশু এই শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন। যদিও ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সামরিক বাহিনী বুলডোজার দিয়ে তা গুড়িয়ে দেয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনির চৌধুরী, মোজাফ্ফর আহমেদসহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। এদেরকে জেলে নিয়ে গেলে সেখানে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়।

প্রথম শহিদ দিবস পালন:

১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনের প্রথমবার্ষিকী শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিন কালো পতাকা উত্তোলন এবং প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে আবুল বরকতের মা এসে তার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় সবাই মুখে মুখে বলতে থাকে গাজীউল হকের লেখা 'ভুলবনা ভুলবনা, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবনা ভুলবনা'। পরের বছরই আব্দুল গাফফার চৌধুরী "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি" গানটি রচনা করেন। সেখান থেকে দুটি দাবি তোলা হয় যার একটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন সরিয়ে বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা (বর্তমান বাংলা একাডেমি) এবং ভেঙ্গে ফেলা শহিদ মিনার নতুন করে তৈরী করে দেয়া।

১৯৫৪ সালের প্রদেশিক পরিষদ নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্টের জয়:

ইতোমধ্যে ১৯৫৪ সালের প্রদেশিক পরিষদ নির্বাচন চলে আসে এবং এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার রাজনীতর মাঠ উত্তপ্ত হতে থাকে। ২১ দফার ভিত্তিতে এ কে ফজলুল হকের নের্তৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। যুক্তফ্রন্টের (আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-প্রজা পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও নেজামি ইসলামী) প্রধান তিন নেতা হলেন শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ২১ দফার প্রথম দফা ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়া, দ্বিতীয় দফা ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা। যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে এবং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মুসলিম লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কৃষক-প্রজা পার্টির প্রধান শেরেবাংলা একে ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। নতুন করে শহিদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন সরিয়ে বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী ইতিহাস এবং শেখ মুজিবের নের্তৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন:

১৯৫৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ দিবস পালন নিয়ে ১৯৫২ সালের মতই উত্তেজনা দেখা দেয়। শত শত নারী-পুরুষকে গ্রেফতার করা হয়। ঐ সময় নারীদের জন্য আলাদা জেল না থাকায় লালবাগে পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্স এর মাঠে তাবু খাটিয়ে নির্মিত অস্থায়ী জেলখানায় তাদেরকে রাখা হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয় এবং সেখানে ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে সংবিধানে পাকিস্তানকে পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুটি ইউনিটে ভাগ করা হয় যাতে করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালগিষ্ঠ হয়ে যায়। দু'বছর যেতে না যেতেই নির্বাচিত সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয়। এরপর

সামরিক শাসনের মাধ্যমে প্রথমে ইসকান্দার মির্জা পরে আয়ুব খান ক্ষমতায় আসেন। দুই সেনা শাসক মিলে প্রায় ১০ বছর শাসন করেন। আইয়ুব খানের আমলেই ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করেন করা হয় যা পূর্ববাংলার মুক্তির সনদ হিসেবে সমধিক পরিচিত। আর মূলত পূর্ববাংলার এই স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার কারণেই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারে সারাদেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পান এবং ২৫ মার্চ আন্দোলনের মুখে আয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৭০ সালের ০৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয় কিন্তু ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উল্টো নুরুল আমীনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালিদের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে ও গণহত্যা শুরু করে। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় স্বাধীনতার ডাক দেন আর শুরু হয় নতুন করে স্বাধীনতার অন্দোলন, শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। নয় মাসের দীর্ঘ যুদ্ধ শেষে তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে, ৪ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এবং ১ কোটি শরণার্থীর বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে দেশে এসে রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন পাকিস্তানীরা আমার ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল, আমার কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি শুধু বলেছিলাম আমার লাশটি যেন দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয় কারণ আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ। স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পাকিস্তানের দোসররা সপরিবারে নৃশংসভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। শেষ হয় এক মহান নেতার অধ্যায়।

বাংলাভাষাকে বঙ্গবন্ধু এতটাই ভালবাসতেন যে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। আমরা এখন বাংলাদেশে বাস করছি, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ দেশ এগিয়ে চলছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহীদ এবং ১৫ই আগষ্টে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

১৯৬০ এর দশকে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি: ৬ দফা (আমাদের বাঁচার দাবি), ১১ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

হারুন-অর-রশিদ [৯]

পাকিস্তান আন্দোলন পর্ব

জাতির পিতা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের সৃষ্টির পূর্বে সকল সংগ্রাম আর আন্দোলনের অগ্রনায়ক। তিনি আর বাংলাদেশ অভিন্ন আত্মা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি ও তাদের দোসররা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বাসভবনে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ৩রা নভেম্বর তারা জেলখানায় হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর ৪ ঘনিষ্ঠ সহযোগী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর আদর্শ, তাঁর চিন্তাধারাকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি, আর কখনো তা সম্ভব হবে না। যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু থাকবেন চির ভাস্বর।

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ বুঝতে হলে কেবল ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাস জানাই যথেষ্ট নয়। একটি জাতির মুক্তির সংগ্রাম বুঝতে হলে খণ্ডিত ইতিহাস জানলেই হবে না। জানতে হবে হাজার বছর বাঙালির জাতি হিসেবে গড়ে উঠার ইতিহাস। জানতে হবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বের এক হাজার বছরের পরাধীনতার ইতিহাস। যুগে-যুগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে এই অঞ্চলে। তাদের সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান সংমিশ্রিত হয়েছে বাঙালিদের সংস্কৃতিতে। এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছে সূফীদের হাত ধরে আর সেই ইসলাম ছিল সহনশীল ও সমন্বয়বাদী। বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মিলনে তাই বাঙালিদের সংস্কৃতি পরিণত হয়েছে এক উদারনৈতিক এবং মিশ্র সংস্কৃতিতে। যার ফলশ্রুতি, এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে ধর্মনিরপেক্ষতার। আর ঐ আদর্শ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে চারটি মূলনীতির একটি হিসেবে স্থান পায়।

অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুইটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পথিকৃত ছিলেন, পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশ। কিন্তু তা সত্য নয়। পাকিস্তানের স্বাধীনতা

৯ উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ ছিল সত্যি, তবে তা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে । পাকিস্তান আন্দোলনের স্বরূপ, দেশবিভাগের কারণ ও পথ-পরিক্রমা না বুঝে, না জেনে, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা, ৬৯এর গণঅভ্যুত্থান কিংবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বোঝা যাবেনা । পটভূমি না জেনে ফলাফল বোঝা যায়না । পাকিস্তান আন্দোলনে পশ্চিমের চারটি প্রদেশের চেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল বাঙালিরা । বাঙালিদের সক্রিয় আন্দোলন ও শক্ত ভূমিকা ছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হতো না । দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ শুধু জিন্নাহর একার প্রচেষ্টা ছিল না। কংগ্রেসও এর ভিত্তিতেই দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিল। হিন্দু মহাসভা, বঙ্গীয় কংগ্রেসের একটি বড় অংশ দেশ বিভাগের পক্ষে ছিল। সর্বভারতীয় কংগ্রেস দাবি করেছিল যে, ভারত যদি ভাগ হতে হয়, তবে বাংলাকেও ভাগ করতে হবে। তাই বলা যায় যে, ভারত বিভাগের দায় শুধু জিন্নাহর একার নয়, নেহেরু- প্যাটেল সহ কংগ্রেস হাইকমান্ডও এর জন্য দায়ী । কেবিনেট মিশন প্লান (১৯৪৬) প্রথমে জিন্নাহ মেনে নিলেও, নেহেরু তা শর্তসাপেক্ষে মেনে নেয়ার কথা জানান। ফলশ্রুতিতে জিন্নাহও তার কেবিনেট মিশনের প্রতি সমর্থন তুলে নেন। এসবের পথ ধরেই হয় দেশ বিভাগ। অবিভক্ত ভারতে মোট জনসংখ্যার এক- চতুর্থাংশ ছিল মুসলমান । জিন্নাহর দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন , যা কংগ্রেস মেনে নেয়নি । সামগ্রিক ভারতের অখণ্ডতার জন্য এতোটুকু ছাড় দিতেও রাজি হয়নি তৎকালীন কংগ্রেস। অথচ বাংলাদেশের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংহতি ধরে রাখার জন্য মাত্র দশমিক ৫৬ শতাংশ পাহাড়ি জনসংখ্যার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদন (১৯৯৭) করা ছিল জননেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত । অথচ অখণ্ড ভারতকে ধরে রাখার স্বার্থে সে সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আচরণ ও সিদ্ধান্ত সুদূরপ্রসারী ছিল না। তাই ভারত ভাগের জন্য জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক ভুমিকা যেমন ছিল, ঠিক তেমনই কংগ্রেসের ভুমিকাও ছিল সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ এবং অপরিণামদর্শী ।

অখণ্ড বাংলার প্রশ্নেও ধর্ম নির্বিশেষে নেতৃবৃন্দ দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। এই বিভাজনের মূলে যেমন ছিল অর্থনৈতিক, তেমনি ছিল ধর্মীয়। কারণ শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক – প্রজা দলটি ছিল একই সঙ্গে মুসলিম প্রধান ও দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী। আর জমিদার শ্রেণী ছিল কংগ্রেস সমর্থক। এই অর্থনৈতিক বিভাজনটি ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক রুপ নেয়। বঙ্গবন্ধুর রচিত ‘কারাগারের রোজনামচা’ এবং ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বই দুটি পড়লেই বোঝা যায় তিনি কতটা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধু ধর্মের উপর ভিত্তি করে দেশ বিভাগের বা পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেননি। তাই যারা বঙ্গবন্ধুকে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান আন্দোলনের একজন তরুণ নেতা হিসেবে মনে করেন, তারা বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারছেন না।

সবার জানা যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তবে লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' নামের কোন রাষ্ট্রের কথা খুঁজে পাওয়া যায়না । সেখানে ছিল মুলত তিনটি রাষ্ট্র সৃষ্টির কথা । ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র (বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) এবং বাকি অংশ নিয়ে হিন্দুস্তান বা ভারত । বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন ছিল মূলত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য। এই পটভূমি জানা না থাকলে আমরা ভুল করে বঙ্গবন্ধুকে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে মিলিয়ে ফেলবো । ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের সম্মেলনে বাংলার আরেক অবিসংবাদিত নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যাতে পাকিস্তান নয়, 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আন্দোলন করেছিলেন। মূলত বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, পাকিস্তানের জন্য নয়। সে সময় যারা প্রগতিশীল নেতা ছিলেন, যেমন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, তাঁরা এই দেশ বিভাগকে ধর্মীয় দিক থেকে না দেখে, দেখেছিলেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে । কিন্তু যারা তখন নেতৃত্বে ছিলেন মূলত তাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তার অভাবে দেশ বিভাগ ধর্মীয় রূপ পায়। এখনও আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে ধর্মকে ভিত্তি করে বিভাজন বা আলাদা হয়ে যেতে দেখি। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ করা হয়, সে সময় হিন্দু নেতৃত্ব এর বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে যখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃতে অখণ্ড বাংলার আন্দোলন হয়, তখন হিন্দু মহাসভা এবং বঙ্গীয় কংগ্রেসের বড় একটি অংশসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ তাতে সামিল হয়নি । বরং তারা বাংলাকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করার দাবি তুলেন, প্রয়োজনে বাংলাকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভক্ত করে । তাই, মুলত এক ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা ও পারস্পরিক ভীতি থেকে তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপা পড়ে যায় । ফলে বাংলা হয় দ্বিধাবিভক্ত । পশ্চিম বঙ্গ যুক্ত হয় ভারতের সাথে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে আর পূর্ব বঙ্গ যুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিবেচনায়। অথচ ১২০০ মাইলের ব্যবধানে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত একটি দেশ যে টিকে থাকতে পারে না, তা সে সময়েই বঙ্গবন্ধুসহ আরো কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিলেন। এই অবাস্তব ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'পাকিস্তানে' তাই শুরু থেকেই অস্তিত্ব সংকট দেখা দেয়।

ভাষা আন্দোলন

বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপাদমস্তক একজন বাঙালি। তার মতো করে বাঙালি সত্তা আর কেউ ধারণ করেননি। তাই তো তিনি বলতে পারেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"। দেশ বিভাগের পূর্বে ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে

মুসলিম লীগ লেজিলেটরস কনভেনশনে যখন এক দিকে কেউ- কেউ উর্দুতে স্লোগান দিতে থাকে, বঙ্গবন্ধু তখন তাঁর সাথীদের নিয়ে বাংলায় স্লোগান দেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই যদি পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিরা অংশগ্রহণ করত, তাহলে তো এত দ্রুত ভাষা আন্দোলন হতো না। সেই চর্যাপদ থেকেই বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ শুরু হয়। মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) বলেন

'যে সবে বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী, সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঢাকার শাহাবাগে একই স্থানে শিক্ষা সম্মেলন হয়েছিল এবং তাতে ভাষা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়, সে অনুষ্ঠানে কেউ- কেউ বলেছিলেন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের ভাষা হবে উর্দু, ফারসি অথবা আরবি। কিন্তু সে সভায় সিলেটের মৌলভি আব্দুল করিম বলেছিলেন, 'না, আমাদের বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভাষা হবে বাংলা'। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য, সত্তা আর কৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভাষা বাংলা হওয়া আবশ্যক। ১৯৩৭ সালের লখনৌ সম্মেলনে জিন্নাহ যখন উর্দুকে মুসলিম লীগের দলীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙালি প্রতিনিধিবর্গ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এভাবে দেশ বিভাগের পূর্ব থেকেই উর্দু আর বাংলা নিয়ে বিতর্ক চলে আসছিল। ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে আমাদের চলবেনা। যেখানে আদর্শের মিল নাই, মতের মিল নাই, ভাষার মিল নাই, চিন্তার মিল নাই, সেখানে এক রাষ্ট্র হিসেবে চলা যায়না । ১৯৬৬ সালে যখন দেশবাসী জানতে চায় কি পথে আমরা চলবো , আমরা ছয়দফা দিলাম, তখন আইয়ুব খান তা থেকে আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেছিল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল ছয় দফা দাবী দিয়ে আমরা কোথায় যেতে চাই"। তাই এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, ছয় দফা ছিল আমাদের মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম সনদ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাড়ে চার মাসের মধ্যেই সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠন এবং ২২ মাসের মধ্যে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই দলের নেতা-কর্মীরা ছিলেন মনে-প্রাণে ধর্মনিরপেক্ষ, তবুও ধর্মীয় উন্মাদনায় সৃষ্ট পাকিস্তানের শাসকদের আক্রমন থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পাওয়ার কৌশল হিসেবে দলের নামের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি সংযুক্ত করা হয়। তারপরও সরকারি মহলের আক্রমণ থেকে তারা রক্ষা পাননি । পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে তাদের একটি উপনিবেশ হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। এ দেশে বিনিয়োগ করে অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে সেখানকার উন্নয়ন করতে থাকে আর এ অঞ্চল রয়ে যায় অনুন্নত। পাঞ্জাবিরা সিভিল সার্ভিসের সব উচ্চ পদ

নিজেদের দখলে রাখেন। কিন্তু নতুন করে শাসিত এবং শোষিত হওয়ার জন্য এ দেশের মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থন দেয়নি। তাই নিজেদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালিরা আন্দোলনে রাস্তায় নামে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে যারা কারাবন্দি হন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের মধ্যে অগ্রণী । ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে (তখন বঙ্গবন্ধু কারাগারে) ফরিদপুর জেলে তিনি ভাষা আন্দোলনকারীদের সমর্থনে ১১ দিন একটানা অনশন পালন করেন। জেলে এবং হাসপাতালে বসে তিনি ভাষা আন্দোলনকারীদের গোপনে বিভিন্ন পরামর্শ দেন । বঙ্গবন্ধু যে কতটা বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন তা বুঝা যায় এভাবে যে, জেলে থাকা অবস্থায় ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সময় তাঁকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পাকিস্তানীদের গোপন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে তাঁকে বিদ্রোহী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাই দেখা যায় যে, ভাষা আন্দোলনে দ্বিতীয় পর্বে বন্দী অবস্থায় পর্দার অন্তরালে থেকে বঙ্গবন্ধু নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।

ইতিহাসের পথ পরিক্রমা এবং ছয় দফা

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা ভাসানি, এ কে ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু সহ বরেণ্য নেতৃবৃন্দ। নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৮ টি আসন প্রাপ্ত হয় এবং মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯ টি আসন। এ কে ফজলুল হকের নেতৃতে গঠিত যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা মাত্র ৫৬ দিন সরকারে ছিল, তারপরেই কেন্দ্রীয় সরকার তা বাতিল করে দেয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল হবার পরে শেরে বাংলাকে অন্তরিন করা হয়। সেইসাথে সমগ্র মন্ত্রিসভার মধ্যে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানি সরকার বঙ্গবন্ধুকে শুরু থেকেই রাষ্ট্রের প্রতি প্রধান হুমকি হিসেবে দেখে আসে । এর পরে ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় তিনি মন্ত্রি হিসেবে যোগদান করে মাত্র ৯ মাস ঐ পদে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। দলের জন্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগের এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল ঘটনা । তিনি ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা করেন, কেবলমাত্র পাকিস্তানের বিরোধী দলের ভুমিকা পালন করার জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে তথা বাঙালির জাতীয় মুক্তির জন্য। জাতির এই মুক্তির সনদ হিসেবেই দেয়া হয়েছিল ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা । ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রকট । বঙ্গবন্ধু ১৯৬১ সালে কমরেড মনি সিংহ এবং খোকা রায়ের সাথে এক গোপন বৈঠকে বাঙালির মুক্তির জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পৃথক বা স্বাধীন হওয়া একান্ত আবশ্যক

বলে মতামত প্রকাশ করেন এবং এ লক্ষ্যে কাজ করার জন্য তাঁদের সহযোগিতা কামনা করেন। মনি সিংহ এবং খোকা রায় বঙ্গবন্ধুকে নীতিগত সমর্থন প্রদান করেন, তবে এখনো তার জন্য উপযুক্ত সময় আসেনি বলে মতামত প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু কিন্তু গোপনে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ১৯৬২ সালে ভারতের আগরতলা যান এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রি সচিন্দ্রলাল দেবের সাথে বৈঠক করেন। এর পূর্বে তিনি একই বছর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরুকে লেখা এক চিঠির মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর জন্য এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। আপামর জনগণের কাছে তখন এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানীদের কাছে অবহেলিত এবং একটি উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয় । পাক-ভারত যুদ্ধের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রি এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় 'তাসখন্দ চুক্তি' করেন। এই চুক্তির বিরোধিতা করে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে সর্বদলীয় এক সম্মেলন ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়, যাতে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা এটিকে 'অতি র‍্যাডিকেল' হিসেবে চিহ্নিত করে তা উপস্থাপনে বাধা দেয়। বঙ্গবন্ধু কনভেনশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং ঢাকায় ফিরে ১১ই ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম ছয় দফা উপস্থাপন করলেন। নিজেদের হাতে নিজেদের শাসন এবং মুক্তির ভার নেয়ার জন্যই তিনি ছয় দফা পেশ করেন। ছয় দফা উপস্থাপনে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমনভাবে এটি উপস্থাপন করেন যাতে তাকে একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা না যায়, আবার এটি বাস্তবায়ন করলে স্বাভাবিকভাবেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায় । প্রথম দফায় তিনি সংসদীয় ধরনের সরকার দাবি করলেন, যাতে এক মাথা এক ভোট কার্যকর হবে। দ্বিতীয় দফায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা ক্ষমতা রাখার কথা বললেন; আর বাকি সব ক্ষমতা থাকবে ফেডারেল ইউনিট বা অঙ্গরাজ্যের হাতে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে রেখে চাহিদামত প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার কথা তিনি তার তৃতীয় দফায় উল্লেখ করলেন। চতুর্থ দফায় তিনি দুই অঞ্চলের জন্য দুই ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা অথবা এক ধরনের মুদ্রা,তবে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মুদ্রা পাচারের হিসাব রাখার কথা বললেন। পঞ্চম দফায় তিনি বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি করার অধিকার প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করার কথা বললেন। পরিশেষে, ষষ্ঠ দফায় তিনি আত্ম-নিরাপত্তার স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী এবং অস্ত্রাগার নির্মাণের দাবি তুললেন ।

ছয় দফাকে বলা হয় বাঙালির 'ম্যাগনাকার্টা' , বাঙালির মুক্তির মহাসনদ। ১৯৬৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক মহাসমাবেশে তিনি ছয় দফা জনগণের সামনে সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন এবং তার ব্যখ্যা করেন। এরপরে বিভিন্ন সমাবেশে এবং কনভেনশনে তিনি ছয়দফা উপস্থাপন এবং তার পক্ষে জনসমর্থন আদায় করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের সম্মেলনের কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন । এই সম্মেলনেই ' আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই গান উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে বাজানো হয়, যার পথ ধরে পরবর্তীতে এটি আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি পায় । আরও উল্লেখ্য যে, এই সম্মেলনেই ছয়দফাকে অনুমোদন দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তখন ছয়দফার পক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে জনসমাবেশে তা প্রচার করতে শুরু করলেন। সেই সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে একের পর এক মামলা করতে থাকে আইয়ুব সরকার। তিন মাস অবিরাম ৬ দফা কর্মসূচি প্রচারের পর ৮ই মে, ১৯৬৬ তাঁকে ঢাকায় গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয় । এরপর দীর্ঘ বন্দিজীবন কাটিয়ে ১৯৬৯ সালের গনঅভ্যুত্থানের পর তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ

১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে কারাগারে অন্তরীন থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন বাঙালিকে অভিযুক্ত করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হয়, অভিযোগে বলা হয়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অভিযুক্তরা ভারতের ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ভারতীয়দের সহযোগিতায় সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র করে। এই মামলার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠে ছাত্র- জনতা তথা সর্বস্তরের বাঙালি । ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ছয় দফা দাবি দিবসে হরতাল ডাকা হয়েছিল, যা ছিল ছয়দফা এবং আমাদের স্বাধীনতার পথে এক মাইলফলক । ঐ দিন সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী ১৩ জন আন্দোলনকারী গুলিতে নিহত হন, যাদের মধ্যে মনু মিয়া, আবুল হোসেন নামে দুজন শ্রমিকও ছিলেন। শহীদেরা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিলো এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য। অধিকাংশ নেতা তখন জেলে, অথচ ছাত্র- জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ৭ই জুনের হরতাল সফলভাবে পালিত হয় । বঙ্গবন্ধু তখনই মন্তব্য করলেন যে, 'এ দেশের মানুষকে আর স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া থেকে আর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা'।

৭ই জুনের আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৬৯ সালে পাঁচটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আর তাদের দ্বারা রচিত হল ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচি। ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, সাইফুদ্দিন মানিক প্রমুখের নেতৃত্বে রচিত হল এই

১১ দফা। ১১ দফায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা এবং অফিস আদালতেও মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়। এছাড়াও ছাত্রদের বেশ কিছু দাবি এ ১১-দফায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। একইসাথে ছাত্ররা তাদের ১১ দফায় ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ , নৌ বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সদরদপ্তর, অস্ত্রাগার বাংলাদেশে স্থাপন করারও দাবি অন্তর্ভুক্ত করে। সর্বোপরি, ১১ দফার ৩ নং দফায় ছয়দফার সবগুলি দফা অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্ররা ছয়দফাকে তাঁদেরও প্রাণের দাবি হিসেবে গ্রহণ করে। এ ছাড়াও এই ১১ দফার মধ্যে কৃষক-শ্রমিকের অবস্থার উন্নয়নের দাবি এবং সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা সর্বস্তরের মানুষের কাছেও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ছয় দফা এবং এগার দফার দাবিতে ছাত্র-জনতা, কৃষক- শ্রমিকেরা এক হয়ে যায় । শুরু হল দুর্বার গন-আন্দোলন। এক পর্যায়ে মাওলানা ভাসানির এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ তাকে আরও বেগবান করে। ছাত্র-জনতা 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো' এই স্লোগানসহ অগ্রসর হয়।

১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি আন্দোলনরত অবস্থায় নিহত হলেন ছাত্রনেতা আসাদ। ২৪শে জানুয়ারি নিহত হলেন ঢাকা নবকুমার ইন্সটিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আইয়ুবের সামরিক জান্তা হত্যা করলো 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি শহীদ হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রকটর ডঃ শামসুজ্জোহা। এইসব হত্যাকাণ্ড বৃথা যায়নি। গর্জে উঠলো বাংলাদেশ। পথে নেমে এল আপামর জনতা। সংঘটিত হল ৬৯এর গণ অভ্যুত্থান। এই গণ অভ্যুত্থানের ফলে ২২শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব সরকার বাধ্য হল বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। শুধু তাই নয়, প্রত্যাহার করতে হল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। এভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় আইয়ুব খানের নীলনকশা। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দশ লক্ষাধিক জনতার সামনে সে সময়ের ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

এরপরে আইয়ুব খানের ডাকা রাওয়ালপিন্ডি গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু আবারও ছয় দফা উপস্থাপন করলেন। আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা গ্রহণ করলেন না। এর অব্যবহিত পরেই তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসে এক বছর পরে ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলেন। তিনি 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' (এল এফ ও) এর মাধ্যমে নিয়ম বেধে দিলেন যে, নির্বাচনের ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রনয়ন করতে হবে, নাহলে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন। মাওলানা ভাসানী নির্বাচন বর্জন করলেন।

বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি আসন লাভ করে। ৭ টি মহিলা আসনসহ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭ টি আসন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ হল সরকার গঠনের একমাত্র দাবিদার। প্রথমে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ' পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী' বলে ঘোষণা করলেও, আসলে তা ছিল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি এরপরে বঙ্গবন্ধুকে ছয় দফা দাবি থেকে সুকৌশলে সরিয়ে আনার চেষ্টা চালান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের ফাঁদে পা না দিয়ে , উলটো তিনি তাঁর দলের নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্যকে শপথ করান যাতে কেউ ছয় দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করেন। এখানেই বঙ্গবন্ধুর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে।

ইয়াহিয়া যখন দেখলেন বঙ্গবন্ধু ছয় দফার ব্যাপারে অটল, অনড়, তখন তিনি তখন পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে মিলে ষড়যন্ত্রের জাল বুনলেন। ৩ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসার কথা ছিল, যা তিনি ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করলেন। সাথে-সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন , যা ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান 'অপরাজেয় বাংলা'র সম্মুখস্থ বটতলায়, বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করে । ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পল্টনে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-জনতার সভায় ছাত্রলীগ ও স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা' হিসেবে ঘোষণা দান করেন। সেই সাথে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহনের ঘোষণা দেয়া হয়। তারপর এল সেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক জনতা সম্মুখে রেখে অনুষ্ঠিত জনতার এক মহাসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ভাষণটি শুরু হয়েছিল ২টা ৪৫ মিনিটে এবং শেষ হয়েছিলো বিকেল ৩টা ৩ মিনিটে। এই ১৮ মিনিটের ভাষণই বাঙালিদের মনে জাগিয়ে তুলেছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো (UNESCO) এই ভাষণকে 'মানবজাতির ঐতিহ্য- সম্পদ এর

এক বিরল দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ভাষণের তাৎপর্য যে কত তা হয়ত ভাষণটি শুনলেই বোঝা যায়। ভাষণটি শুনলেই যেন শরীরের ভেতর আবারও যুদ্ধের শিহরণ জেগে উঠে। ঠিক যেমন ১৯৭১ জেগে উঠেছিল আমাদের দামাল ছেলেদের মধ্যে। মূলত ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষকে চারটি শর্ত দিয়ে ভাষণের শেষাংশে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ভাষণটির কিছু অংশের বাখ্যা করা যাক। ভাষণটিতে শুধু যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়াই হয়নি, বরং সেই সাথে কী ভাবে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে তাও বলা হয়েছে। ভাষণে তিনি বলেছেন, '২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেন তাদের বেতন নিয়ে আসেন'। এরপর বলেছেন, 'যদি বেতন না দেয়া হয়, আর আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের ওপর (কাছে) আমার অনুরোধ রইল- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।' এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অধিকার এবং তা আদায়ের জন্য যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। আর সেই অধিকার আসবে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ আর নিয়ন্ত্রণের শেকল ভেঙে। ওই সময়ে বঙ্গবন্ধুর প্রাণের সংশয় ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, 'রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।' এর অর্থ দাঁড়াল, যে-কোনো 'অবস্থায়' যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ভাষণে তিনি আরও বলেছিলেন 'ভাতে মারব, পানিতে মারব'। এখানে তিনি পাকিস্তানী বাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পর্যুদস্ত করার কথাই বলেছিলেন।

১৮ মিনিটের এই ভাষণের প্রভাব আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপর কতটা পড়েছিল, তা ২৫ মার্চের রাত আমাদের বলে দেয়। ওই দিন রাতে ঢাকা শহরে শুরু হয় নির্বিচার গণহত্যা, ধর্ষণ। কিন্তু বাংলার দামাল ছেলেরা তাতে ভীত হয়নি। বরং নয় মাস নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে গেছে পাকিস্তানী হায়েনার বিরুদ্ধে, বাঙালিদের জন্য একটি সুন্দর লাল সবুজের পতাকার জন্য। তাদের অদম্য সাহস আর বীরত্বের পেছনে যে শক্তিটি কাজ করেছে তা হলো, বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ মার্চের ভাষণ, যা আজও শুনলে শরীরে শিহরণ উঠে।

৭ মার্চের ভাষণের পরও ইয়াহিয়া খান নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন বঙ্গবন্ধুকে সরকারের দায়িত্ব অর্পণে। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা হতে থাকে সৈন্য আর অস্ত্র। ২৫শে মার্চ

পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকা শহর ও দেশের বিভিন্ন স্থানে একযোগে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে নির্বিচার গণহত্যা শুরু করে। গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু ইপিআরের এক হাবিলদার মেজরের সহায়তায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। শুরু হল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। এভাবে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হল আমাদের বহু কাঙ্খিত স্বাধীনতা। পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ। আজ আমরা পেয়েছি স্বাধীন ভূমি, পেয়েছি নিজেদের অধিকার, পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা আর প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আজ যখন কিশোর-কিশোরীর হাতে লাল-সবুজের পতাকা দেখি তখন গর্বে বুক ভরে উঠে। কিন্তু কেউ কি হিসেবে করেছি এ জন্য কত মুল্য দিতে হয়েছে । লোকসংগীত শিল্পী আব্দুল লতিফ তাই গেয়েছেন -

"আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা

কারো দানে পাওয়া নয়।

আমি দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি

জানা আছে জগৎময়।"

অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছেন আর ৫ লক্ষ মা-বোন হারিয়েছেন তাঁদের সম্ভ্রম। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না। আজও পাকিস্তানীদের কলোনি আর গোলাম হয়ে থাকতাম। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতা অভিন্ন সত্তা। তাঁর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে তাঁকে কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরা স্মরণ করছি, জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা । ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যসহ অত্যন্ত নির্মম- নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তারই রক্ত ও আদর্শের উত্তরাধিকারী কন্যা শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর চিরজীবনের 'সোনার বাংলার' স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর জাতির পিতার কোনো মৃত্যু নেই। বঙ্গবন্ধু মুজিব অবিনাশী, মৃত্যুঞ্জয়। কবি অন্নদাশংকর রায়ের কথায়-

"যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা, গৌরী, মেঘনা বহমান

ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ

আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক [১০]

বঙ্গবন্ধু সত্যিকার অর্থে এত বিশাল, যেমন সমুদ্রের পরিমাপ করা খুব কঠিন বা হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে হেঁটে গেলে হিমালয়ের বিশালত্ব বোঝা কঠিন। বঙ্গবন্ধু প্রকৃতই অনেক বিশাল। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সেই মহান ব্যক্তিত্বকে এখনও সেইভাবে বুঝতে, ধারণ করতে এবং লালন করতে পারিনি।

বঙ্গবন্ধু যে পাকিস্তান ভেঙেছেন, তা তিনি সৃষ্টি করার মুখ্য কারিগর না হলেও একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তার রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং বেঙ্গল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর ভাবশিষ্য হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল, যে গণভোট হয়েছিল-যে এক ভারত না বিভক্ত ভারত অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভুমি হবে কি না সে বিষয়ে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছেন। কংগ্রেসের দাবি ছিল অবিভক্ত ভারত আর তদানীন্তন মুসলিম লীগের দাবি ছিল মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি। সেই দাবিতে তিনি সেই সময়কার একজন সফল ছাত্রনেতা হিসেবে, কলেজের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলাদেশ চারণের বেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, পাকিস্তানের পক্ষে ভোট চেয়েছেন। পাকিস্তান কায়েমে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি সিলেটকে যখন ভারতের অংশ হিসেবে গণ্য করার জন্য কংগ্রেস দাবী তুলেছিল এবং আপত্তি তুলে এ বিষয়ে গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তখনও তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য সিলেটের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এককথায় একজন তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টিতে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু মাত্র দুই/তিন মাসের ব্যবধানে পাকিস্তানের যাঁরা দন্ডমুন্ডের কর্তা ছিলেন তাঁরা বললেন উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানের লোকসংখ্যার ৫৬ ভাগ ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৪ ভাগ। এই ৪৪ ভাগের ভাষাও উর্দু ছিলনা, এর মধ্যে ছিল পশতু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচি ইত্যাদি। মাত্র ৭ ভাগ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। যদি ধরেও নেয়া যায় যে ৪৪ ভাগের ভাষা ছিল উর্দু, তারা ৫৬ ভাগ

১০ মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লোকের ভাষাকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করলো। বাঙালি ছাত্রনেতারা, সেদিনের তরুণ নেতা শেখ মুজিবসহ জাতীয় নেতারা দাবি করেছিলেন উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক। খুবই ছোট্ট দাবী, সেই দাবীটুকুও তারা মেনে নেয়নি। সেই দিনই বঙ্গবন্ধু, যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজ শাসক-শোষকদের পরিবর্তে পাঞ্জাবি শাসক-শোষক পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা পাইনি। তাই ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন এবং ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য স্বপ্ন দেখেন বা তার বীজ বপন করেন।

অনেকেই ছিলেন সেদিন, তিনি একাই স্বপ্ন দেখেননি, কিন্তু অন্যরা ঝরে পড়েছিলেন। এই দীর্ঘ ২৩ বছরের দৌড়ে অনেকেই ঝরে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব এখানেই, যে তিনি টিকেছিলেন এবং শত অত্যাচার-অবিচার নির্যাতন সহ্য করে, মাথা উঁচু করে কোনরকম আপস না করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি টিকে থেকেছেন। সেজন্য ১৯৪৮ সালে হয়তো তিনি তৃতীয় গ্রেডের নেতা ছিলেন, ৭১ সালে তিনি একক নেতায় পরিণত হলেন। অন্যেরা যেমন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি, বঙ্গবন্ধুর খুব শ্রদ্ধেয় একজন নেতা ছিলেন। একটা পর্যায়ে তিনি টিকে থাকতে পারেননি, আপস করেছেন। এমনকি একথাও বলেছেন, যখন চীনের সাথে তাদের সখ্য খুব বেড়ে যায়, "ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব"। চীনের এই আদেশে বা হুকুমে তাঁদের মতো অনেক তেজস্বী নেতা খসে পড়ে। চীনপন্থী যাঁরা ছিলেন তাঁরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে পরে বলেছেন দুই কুকুরের কামড়া-কামড়ি অর্থাৎ এক সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে আরেক সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়া। ওনারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ওইভাবে আর টিকতে পারেননি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু, শত অত্যাচার প্রলোভন সবকিছুকে অতিক্রম করে টিকে থেকেছেন, তাঁর একক নেতৃত্বে শেষ পর্যায়ে এই দেশ স্বাধীনতার আলো দেখেছে।

১৯৫৪ সালে এই অঞ্চলে একটা নির্বাচন হয়েছিল, মাত্র ৯ টি আসন তৎকালীন মুসলিম লীগ পেয়েছিল। এমন অবস্থা ছিল সেই সময়ে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা মুখে বলা যেত কিন্তু মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কথা বলা যেতনা। নির্বাচনের সময় বলেছে, যে নৌকায় ভোট দেবে বা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিবে তার বউ তালাক হয়ে যাবে অর্থাৎ ধর্মকে সব সময়ই তারা নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করেছে। কেউ যখন মানুষের বা বাঙালির অধিকারের কথা বলেছেন তারা তখন ধর্মকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

১৯৫৪ সালে ইলেকশনের সময় প্রচার করা হয়েছিল, যদি যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেই তবে সেটা হবে ধর্ম বিরোধী। বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে। যারা ধর্মের তথাকথিত সোল এজেন্ট তারা সেসময় বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষাতো বলেছেই, এমনকি আল্লাহ বিরোধী ভাষা

হিসেবেও প্রচার করতো। মানুষের অধিকারের কথা বললেই প্রতিপক্ষ হিসেবে ইসলামকে দাঁড় করাতো, এ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ২৩ বছর তারা ছড়িয়েছে, এই একই ভাঙ্গা রেকর্ড বার বার তারা বাজিয়েছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুকে ১৫ আগস্ট স্বপরিবারে হত্যা করার পরও দেশকে আবার মিনি পাকিস্তান বানানোর জন্য আবার সেই একই কথা ধর্ম গেল, ভারত আসলো ইত্যাদি অনবরত বলেছে।

তারা ২৩ বছর ধরে প্রচার করেছে ইসলাম গেল, কাশ্মীর গেল। এমনিভাবে ধর্মকে প্রতিপক্ষ বানানোর জন্য, ধর্মকে ব্যবহার করে, মিথ্যাচার করে এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম এসব করেছে। প্রকৃত আলেম কখনো একথা বলেননি। সেগুলোর আলামত এখনও মাঝে মাঝে দেখা যায়। সন্ত্রাস করে, মানুষ হত্যা করে ইসলাম কায়েম করবে, এগুলো একই ধারাবাহিকতা।

এই দেশের অবিসংবাদিত নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোরের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। আইয়ুব খান তখন ছয় দফার জবাবে বলেছিলেন যে, অস্ত্রের ভাষায় তিনি জবাব দিবেন, "ল্যাঙ্গুয়েজ অব উইপন্স" শব্দটিই তিনি ব্যবহার করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার আড়াই বছর পর, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়, বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় দেশদ্রোহী। মামলার অভিযোগে তিনটি কথা বলা হয়েছিল যে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ছাত্রলীগের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে সুসংগঠিত করছেন ও গোপনে অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছেন, দ্বিতীয় প্রধান অভিযোগ ছিল শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বাঙালি সৈন্যদেরকে উস্কানি দিচ্ছেন, প্রভোক করছেন, একইসাথে বাঙালি যারা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন তাদের কথা বলেছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনজন বাঘা বাঘা সিএসপি অফিসার আসামি ছিলেন- শামসুর রহমান খান, আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস। এরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী আমলা। পাকিস্তানীদের ভাষ্য অনুসারে সরকারি কর্মচারীরা শেখ মুজিবের প্ররোচনায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে। ২৩ বছরে কোন বাঙালি সিএসপি সচিব হতে পারে নাই। ১৯৬৯ এ এস এম এ রশীদ সাহেব কে ভারপ্রাপ্ত সচিব বানানো হয়েছিল। ১৯৬৬ এর আগ পর্যন্ত কোন বাঙালি অফিসার কেন্দ্রীয় সরকারের উপসচিব হতে পারে নাই। ৬৬ সালের পরে আন্দোলনের কারণে দুই এক জনকে কোনমতে প্রোমোশন দিয়েছে।

একশত বিশটার মতো দূতাবাস ছিল আমাদের, একজন বাঙালিও রাষ্ট্রদূত হয়নি। অপরাধ ছিল তারা বাঙালি। এতেই বোধগম্য হয় বাঙালিদের বিষয়ে বিদ্বেষ ঘৃণা তাদের কোন পর্যায়ে

ছিল । আইয়ুব খান তার লেখা বই "ফ্রেন্ডস নট মাস্টার" এ বলেছেন "নন মার্শাল রেস" অর্থাৎ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়ার যোগ্য নয় বলে বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হতো না। ৫৬ ভাগ মানুষের এই দেশ থেকে সেনাবাহিনীতে ছিল মাত্র ৭ ভাগ, ওরা ছিল ৯৩ ভাগ। কোন ব্যবসা বাণিজ্য বাঙালিদের ছিলনা, আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের কোন ব্যবসায়ীর লাইসেন্স ছিলনা সব ব্যবসায়ী ছিল ওদের। শেষদিকে চট্টগ্রামের একজন ব্যবসায়ী একটা লাইসেন্স পান।

তাদের ওখানে তিনটা রাজধানী করেছে, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদ, বাংলার পয়সায়। সোনালী আঁশ পাট এবং চা বিক্রি করে বাঙালিরা শতকরা ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করত, যার বিপরীতে তাদের জন্য খরচ করা হতো মাত্র ১৮ ভাগ। পক্ষান্তরে তুলা বিক্রি করে ওরা উপার্জন করতো মাত্র ২০ ভাগ আর খরচ করতো ৮২ ভাগ। কাগজ তৈরি হতো পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় আর শুধুমাত্র জলছাপ দেয়ার জন্য সেগুলোকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো। এরপর সেই কাগজ পাকিস্তান থেকে আমদানী করে এদেশের মানুষকে বেশি দামে কিনতে হতো। অথচ এদেশে একটা মেশিন বসালেই পারতো। এসবের মাধ্যমে পরিস্কার হয় সর্বস্তরে কী অত্যাচার হয়েছে। তাদের অবিচার, নির্যাতন নিষ্পেষণের লম্বা ফিরিস্তি দেয়া সম্ভব। কত বড় অবিচার অত্যাচার অনাচার শোষণ-নির্যাতন। এদেশের মানুষের মধ্যে এমনি এমনিই স্বাধীনতার খায়েশ জন্মেনি। ১৯৬২ সালে এদেশে ছাত্রলীগ বাংলা ভাষা প্রচলন সপ্তাহ পালন করে। সমস্ত ঢাকা শহরে একটা সিঙ্গেল সাইনবোর্ড ছিল না বাংলায়। সকল সাইনবোর্ড লিখা হতো উর্দুতে সাথে ছোট করে ইংরেজিতে লিখা হতো।

এদেশের মানুষের উপর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচার কি পরিমাণ হয়েছে এটা বলার মত নয়। ১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সংসদে দাঁড়িয়ে বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে, এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে বাঙালিরা নিজের মত করে ভাবতে বাধ্য হবে।

বলা হয় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলেন, মানুষ জেগে উঠলো, আর ২৬ তারিখ থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একেবারেই সত্য কথা নয়। ২৩ বছরে বঙ্গবন্ধু জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে। সেই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তিনি জনগণের মনের কথা বুঝতে পারতেন, বুঝতে পারেতন কখন কী বলতে হবে। ১৯৪৮ সালে সরাসরি স্বাধীনতার কথা মানুষকে বললে তা হজম করা সম্ভব হতোনা। বঙ্গবন্ধু বলতেন ছয় মাসের বাচ্চার ওষুধ যুবকদের দিলে কি সেই ওষুধে যুবকদের রোগ সারবে? বঙ্গবন্ধু আগে মানুষকে প্রস্তুত করে তারপর কর্মসূচি দিতেন। তাঁর সফলতার সবচেয়ে বড় কারণ এটাই ।

১৯৬৯ সাল জনাব তোফায়েল আহমেদ তখন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট, আ স ম আব্দুর রব সেক্রেটারি ছিলেন। গণঅভ্যুত্থান এমনভাবে ছাত্রনেতারা গড়ে তোলেন যে সে সময়ের লন্ডন টাইমস এর কভার স্টোরি ছেপেছিল জনাব তোফায়েল আহমেদ এর ছবি দিয়ে। তারা লিখেছিল "তোফায়েল, দি ভার্চুয়াল প্রেসিডেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান"। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কথা ছাড়া সেসময় একটা পাখিও ওড়ে নাই অর্থাৎ আন্দোলনের মাত্রাটা এমন পর্যায়েই গিয়েছিল। ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল তার আগে আইয়ুব খান নির্বাচনের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। এই নির্বাচনে আঞ্চলিকতার কথা বলা যাবে না, দুই দেশের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এমন কোন কথা বলা যাবে না। বঙ্গবন্ধু এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন যে আমি নির্বাচনে যাব। সেই সময় বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগের নেতাদের ডাকলেন তাদের মতামত শোনার জন্য। ছাত্রলীগের ২৬ জন তরুণ নেতা বক্তব্য দিলেন এবং বললেন যে আপনি দাসখত দিয়ে ইয়াহিয়া খানের অধীনে নির্বাচনে যাবেন এজন্য আমরা কারফিউ ভেঙ্গে জীবনবাজি রেখে আপনাকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করিনি। এই দাসখত দেয়া ইলেকশনে যাওয়া যাবেনা। বঙ্গবন্ধু প্রথমে উত্তেজিত হয়ে গেলেন, বললেন "Leader leads, he is not led by others, তোরা যদি আমারে নেতা মানোস তাহলে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমার, কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তা আমি দেখবো।" তিনি উত্তেজিত স্বরে ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন "তোরা কি বিশ্বাস করস, আমি স্বাধীনতা চাই?" তরুণ নেতারা সমস্বরে বলে উঠলেন "আপনি শুধু চান তা না, আপনি স্বাধীনতার কথা জাতিকে ভাবতে শিখিয়েছেন"। তিনি বললেন তাহলে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কম রক্তপাতে আমার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর। তারপর তিনি যে কথাগুলো বললেন তার মর্মার্থ এই যে আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নির্বাচনে যেতে চাইনা। নির্বাচনে যেতে হবে, দল এবং নেতা হিসেবে জনগণের ম্যান্ডেট নেয়ার জন্য। বাঙালির নেতা কে তা প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে। এটাকে গণভোট হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। মানুষের কাছে ভোট চাইতে হবে, ছয় দফার ভোট। এই অর্থে ছয়দফার পক্ষে এটা গণভোট। তারপর তিনি বললেন "আমাকে যদি তোরা ভোট দেস, বাঙালির ম্যান্ডেট যদি আমি পাই, লাথি মেরে এই এলএফও (লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডার), ১৯৭০ বুড়িগঙ্গা নদী না, সিন্ধু নদীর ওপারে কীভাবে ফালাই দিতে হবে সে শক্তি আমার পায়ে আছে। তোরা যা, গিয়ে কাজ কর"। তারপর বললেন "নির্বাচনের মাঠে শুধু বলবি ছয়দফা না মানলে একদফার আন্দোলন শুরু হবে"। একদফা কী তা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই। তিনি আরও বললেন "এইভাবে কথা বললে আমার আওয়ামী লীগ নেতারা তোদের মঞ্চ থেকে নামাইয়া দিবে"। কারণ এ কথা শুনলে মানুষ বিগড়ে যাবে, ভোট পাওয়া যাবেনা। আওয়ামী লীগ নেতারাও সেটা চায় কিন্তু প্রকাশ্যে বলার সময় এখনো আসেনি। তোদের কথা তোরা বলবি তোদের মত করে, তারা তাদের মত করে প্রচার চালাবে। কর্নেল শওকত আলী তার বইয়ে লিখেছেন, আগড়তলা মামলা চলাকালে

বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে এই আন্দোলনে আইয়ুব খান টিকতে পারবেনা, আমরা মুক্তি পাব, নতুন কোন ডিক্টেটর আসবে, একটা ইলেকশন দিতে বাধ্য হবে। সে ইলেকশনে আমরা জিতব কিন্তু ক্ষমতা পাবনা। যুদ্ধ করেই দেশ স্বাধীন করা লাগবে। বঙ্গবন্ধু এমন দূরদর্শী নেতা ছিলেন যে উনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন।

কেউ কেউ বলে থাকেন, যুদ্ধের ডাক দিল আর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর ২৩ বছরের প্রস্তুতি ছিল এবং প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ৭ই মার্চের ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি", কারণ তিনি জানতেন, যে কোন সময়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, খুন করা হতে পারে। তিনি বললেন "তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো", গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন, শত্রু যে পাকিস্তানীরা এটাও বলে দিলেন। "ওদের ভাতে মারবো-পানিতে মারবো" গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম। তাদের জন্য সবকিছু বন্ধ করে দিতে হবে। "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ"। পরিষ্কার মেসেজ "আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে তোমরা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", তিনি গুরুত্ব দিলেন মুক্তিকে। পাকিস্তান আমলেও তো আমরা স্বাধীন ছিলাম, কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার ডাক দিলেন কেন? কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতায় শেষ কথা নয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে । সেজন্য বললেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম", তিনি তাঁর ভাষণে ৬ বার মুক্তির কথা বলেছেন। তারপর বললেন "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", মুক্তির জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন।

অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সেদিনই কেন তিনি পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না। সেদিন মাথা গরম তরুণ নেতাদেরও দাবি ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। তিনি সেদিন পরিষ্কারভাবে বলেন নাই, কারণ সে ক্ষেত্রে এটা হয়ে যেত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। বিশ্ব জনমত পক্ষে থাকতো না। বঙ্গবন্ধু বলতেন বাঙালির জনমত তো আগেই ছিল, বিশ্বজনমত প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্য। সেদিন যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করা হতো তাহলে পাকিস্তান সরকার সারা বিশ্বকে বলতো যে আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী সরকারকে সেই সুযোগ দেন নাই। সাংবাদিকরা তাকে বলেছিলেন যে, আপনি তাঁর (ইয়াহিয়া) সাথে সংলাপ করছেন আর সে তো জাহাজে করে সৈন্য আনছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। তিনি বললেন আমার লোকেরাও তো গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করছে, ট্রেনিং দিচ্ছে, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু বৈশ্বিক কূটনীতিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি

যখন দেশে ফিরলেন, বঙ্গবন্ধু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে প্রথম দেখাতেই বলেছেন আপনি মতিলাল নেহেরুর নাতনি, জওহরলাল নেহেরুর মেয়ে, আপনি ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী, আপনার কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ আমার মুক্তির জন্য, বিশ্বের এমন কোন দেশ নাই যে আপনি দাবি করেন নাই আমার মুক্তির জন্য, আপনি আমার এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকম সহযোগিতা করেছেন। আমরা আপনার কাছে ঋণী কিন্তু আমি জানতে চাই মিত্রবাহিনী কবে আমার দেশ ছাড়বে। মাত্র তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনী নিজ দেশে ফিরে গেছে। এগুলো হল দূরদর্শিতা।

বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তি পেয়ে ইংল্যান্ডে গেলেন সেই সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অ্যাডওয়ার্ড হিথ। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে বঙ্গবন্ধু যাওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ প্রটোকলের নিয়ম ভেঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী গাড়ির কাছে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। ওই সময় প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নিন্দা প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে বলা হয়েছিল তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির গাড়ির দরজা খুলে ব্রিটিশ জনগণকে অপমান করেছেন। জবাবে অ্যাডওয়ার্ড হিথ বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নন, তিনি এমন একজন বিপ্লবী নেতা যিনি তাঁর দেশে বিপ্লব শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন, যা পৃথিবীতে আর কোন বিপ্লবী নেতা পারেন নাই। কাজেই তাঁর গাড়ির দরজা খুলে আমি ব্রিটিশ জাতিকে গৌরবান্বিত করেছি, অপমানিত করিনি। এই ছিল বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয়েছিল তখন তিনি হাঁটু গেড়ে স্যালুট করে তাকে সম্মান করেছিলেন এবং বলেছিলেন "ইউ আর সাচ এ গ্রেট রিভোলিউশনারি লিডার"। তার আরেকটি উক্তি আছে "হিমালয় দেখার ইচ্ছা ছিল, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি, আর হিমালয় দেখার প্রয়োজন নাই"। যেদিন আমাদের তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে অভিহিত করা হতো, বঙ্গবন্ধু বিশ্ব সংস্থায় দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে। বঙ্গবন্ধু যে দেশে গেছেন, সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যথাযথ প্রটোকল মেনে বঙ্গবন্ধুকে সম্মানের সাথে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু যখন ভারতে আসলেন তখন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তার মন্ত্রিসভা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সম্মানের সাথে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন অনড় কিন্তু কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে অত্যন্ত সৌজন্যবোধের পরিচয় দিতেন। তিনি এতটাই নম্র এবং বিনয়ী ছিলেন যে তার মত বিনয়ী নেতা পৃথিবীতে বিরল। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সামনে তিনি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছিলেন। কারণ ৭৪ সালের কৃত্রিম দুর্ভিক্ষটা আমেরিকার বানানো ছিল। আমেরিকার কাছ থেকে নগদ

পয়সায় আমরা চাল এবং অন্যান্য খাদ্য কিনেছিলাম কিন্তু সময়মতো জাহাজ আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছে নাই, নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল এবং সেই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের জন্য ২৭ হাজার মানুষ মারা যায়। এই কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি এরকম আচরণ করেছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমরা কারও অধীনস্ত নই।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার তো দেবার মতো কিছু নেই, গোডাউনে কোন খাবার নেই, আমার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রা নেই, সবকিছু বিধ্বস্ত, তোমাদের ওখানে কিছু পাট এক্সপোর্ট করি। তখন যুক্তরাষ্ট্রের আইন ছিল, কিউবার সাথে কেউ যদি বাণিজ্য করে তো সেই দেশকে পিএল ৪৮০ বন্ধ করে দিবে অর্থাৎ সাহায্য দিবে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হুমকি দিয়েছিলেন পিএল ৪৮০ বন্ধ করে দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, আমি তো খয়রাতি নেওয়ার জন্য দেশ স্বাধীন করিনি। এই ছিল আমাদের দেশের প্রতীক, জাতীয় প্রতীক, বাঙালির মান মর্যাদা সম্মান রক্ষার জন্য যেখানে যা করা প্রয়োজন তাই করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন, বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে দেশকে বের করে নিয়ে আসার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, খাদ্যের অভাব দূর করেছিলেন। কেউ বলে নাই, মাত্র এক কলমের খোঁচায় তিনি সকল প্রাইমারি স্কুল কে জাতীয়করণ করেন, কৃষির উন্নয়নে তিনি ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে সফলভাবে অনুসরণ করছেন মাত্র। দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মাথায় এমন চমৎকার একটি সংবিধান তিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছিলেন যা বিশ্বে বিরল। সম্প্রতি মিয়ানমারের সাথে আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে বিশাল সমুদ্র এলাকা জয় করেছে তা ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর করা মামলার ফলাফল। তিনিই বিশ্বে প্রথম সমুদ্র আইন প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরিবারসহ বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার পর পুনরায় দেশকে পিছন দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এদেশকে মিনি পাকিস্তান বানানোর জন্য। একটা জাতির উন্নয়নের জন্য একটা ভিশন বা অভিলক্ষ্য থাকে, বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। তাকে অনুসরণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ১০০ বছরের পরিকল্পনা ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন করেছেন। কারণ একটা রাষ্ট্রের যদি দিক-দর্শন না থাকে তাহলে সেই দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারবে না, মাঝপথে দিক হারিয়ে ফেলতে পারে। বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ১৯৭১ সালে শেষ হয়ে যায়নি, তা চলেছে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চেয়েছিলেন যা এখন পর্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করা যায়নি। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং অধিকার নিশ্চিত করতে হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। এজন্য বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, তাঁর নেয়া সংস্কার এবং প্রশাসনিক উদ্যোগসমূহ নিয়ে আরো বেশি গবেষণা করা প্রয়োজন। দেশকে যদি তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা যদি করতে হয়, ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ যদি করতে হয়, তাহলে বঙ্গবন্ধুর নেয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাকশালকে গালি হিসেবে বলা হয় অথচ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত এই উদ্যোগ নেয়া ছিল সাময়িক। এমনকি বঙ্গবন্ধু তার প্রাণের দল আওয়ামী লীগকেও বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সকল দল মিলে একটি জাতীয় দল গঠন করে উন্নয়নের প্লাটফর্ম তৈরি করেছিলেন এবং সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, যা হতে পারত সর্বস্তরের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি। বঙ্গবন্ধু তার মহানুভবতা ও উদারতা দিয়ে তার শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যার কারনেই হয়তো তাকে জীবন দিতে হয়েছিল। যদি তিনি সে শত্রুদেরকে ক্ষমা না করতেন, তাহলে হয়তো ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতে পারত।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান

ফরহাদ হোসেন [১১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ই জানুয়ারি ঢাকায় এসে পৌঁছালেন এবং এক আবেগঘন বক্তব্য প্রদান করলেন। তিনি ১১ তারিখ থেকেই দেশ গঠনের কাজে লেগে পড়েন যে দেশটি ২০০ বছর ধরে ব্রিটিশ কলোনি হিসেবে ছিল, তারপর ২৪ বছর ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানীদের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। অতঃপর শুরু হয় ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ আচরণ এদেশের মানুষকে দেখতে হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে খুব অল্প সময়ে গুরুত্ব অনুসারে অসংখ্য কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু ভূমিকা রেখেছেন। সংবিধান প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রায় তিন কোটি শরণার্থী পুনর্বাসন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আহত মুক্তিযোদ্ধা, নারী ও এতিম শিশু পুনর্বাসন, কোন কিছুই বাদ যায় নি। বর্বর পাকিস্তান বাহিনী এমন নির্দয়ভাবে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করলে ব্রিটিশ সরকার তাকে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু সেই সময় তারা কোন গ্রাম পুড়িয়ে দেয়নি। ধর্মকে ব্যবহার করে সেই বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেভাবে আমাদের মা বোনদের কে অপমানিত করেছিল, যেভাবে ঘরবাড়িগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল তা ছিল অমানবিক। তারা তাদের মনুষ্যত্ব বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুরো দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বঙ্গবন্ধু কীভাবে এ দেশকে একটি সন্তোষজনক অবস্থায় নিয়ে আসলেন তা সত্যিই অবাক হওয়ার মত। অল্প সময়ের মধ্যে প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ অতিক্রম করে। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায়না, কোন কাজটি কখন করতে হবে তা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। তার মেধা, প্রজ্ঞা এবং সবচেয়ে বড় কথা তার সমস্ত কাজের পিছনে যে অনুপ্রেরণা কাজ করতো তা ছিল মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা যা সারা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভের পর তাদের কাছ থেকে অস্ত্র সমর্পণ করে নেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ শত্রুদের মোকাবেলা করা বিশেষ করে রাজাকার, আলবদর, আলশামস এর কাছেও অস্ত্র ছিল, তাদেরকে নিবৃত করা।

---

১১ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এত সমস্যার মুখোমুখি হয়েও জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, কাজ করেছেন নিষ্ঠার সাথে যা ইতিহাসে এখন স্পষ্ট। বিভিন্ন লেখা ইতিহাস আকারে রয়েছে যা আমাদের পড়া প্রয়োজন। তিনি কীভাবে মানুষের প্রতি কতটা ভালোবাসা রেখে দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করে গিয়েছিলেন তা ইতিহাস থেকে অনুধাবন করা সম্ভব।

যেভাবে হয়েছিল শুরু

'নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা, বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হয়ে বাস করবে, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে-এই আমার সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য। আমি যেন এই কথা চিন্তা করেই মরতে পারি-এই আশীর্বাদ, এই দোয়া আপনারা আমাকে করবেন।' মুক্ত স্বদেশে নেমে এভাবেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কোন অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র কেমন ছিল তা বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রিপোর্টে দেখা যায়।

'Bangladesh inherited a poor, undiversified economy, characterized by an under-developed infrastructure, stagnant agriculture, and a rapidly growing population. She had suffered from years of colonial exploitation and missed opportunities with debilitating effects on initiative and enterprise. Superimposed on all these were the effects of the war of liberation, which caused serious damage to physical infrastructure, dislocation in managerial and organizational apparatus and disruption in established external trading partnership.'

মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি

সে সময় দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল সরকারি-বেসরকারি ভবন, যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগসহ সমগ্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা। মাত্র ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিপর্যস্ত ছিল শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কাঠামো। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার তখন মাইনাস ১৪ শতাংশ। ছিল সংবিধান ও আইনের শূন্যতা। সামনে ছিল পুনর্বাসনসহ দেশের জনগণের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

নং	সরকারি খাত	দশ লক্ষ টাকার হিসাবে
১)	পরিবহন	১,২২৬.৫৮
২)	বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২২৬.২৯
৩)	শিল্প	১৩৪.৭০
৪)	যোগাযোগ	৫০.৮৫
৫)	সমাজ কল্যাণ	২২০.৯০
৬)	গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন	১০৭.৬২
৭)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	১০৮.২৬
৮)	পানি	৭২.৬৬
৯)	কৃষি	৮৪১.৯০
১০)	স্বাস্থ্য	৬৮.৪৩
১১)	শিক্ষা	১৫০.০০
মোট:		**৩,২০৮.১৯**

ক্রমিক নং	বেসরকারি খাত	দশ লক্ষ টাকার হিসাবে
১)	কৃষি	২৫০.০০
২)	গৃহ নির্মাণ	৮,২৫০.০০
৩)	হাট বাজার	৩৫.০০
৪)	কারিগর-ব্যবসায়ী	৭৫০.০০
	মোট:	৯,২৮৫.০০
সর্বমোট: (সরকারি + বেসরকারি)		**১২,৪৯৩.১৯**

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া

সংবিধান ও আইন প্রণয়ন

দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের মাত্র এক বছরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

- এটি ছিল সুলিখিত দলিল এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় উন্নতমানের।

- ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতিগুলো হচ্ছে - বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।
- সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ ...'

১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৪৫৩টি প্রেসিডেন্ট অর্ডার/অধ্যাদেশ/আইন প্রণীত হয়। মাত্র ৭৬টি অর্ডার/অধ্যাদেশ/আইন বিলুপ্ত হলেও বাকিগুলো এখনও কার্যকর রয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিলেন তিনি তা নিম্নের কিছু উল্লেখযোগ্য আইনের শিরোনাম থেকেই বুঝা যায়-

- Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974
- The International Crimes (Tribunals) Act, 1973
- The Water Pollution Control (Amendment) Act 1974
- The Bangladesh Wildlife (Preservation) (Amendment) Act 1973
- The Bangladesh Petroleum Act, 1974
- The Primary Schools (Taking Over) Act, 1974 ইত্যাদি।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থী পুনর্বাসন

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থী পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধু ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন । রিলিফ ও পুনর্বাসনের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ১৯৭২ সালে দুই কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন ও অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। সরকার গ্রাম পর্যায়ে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৬ হাজার ত্রাণ কমিটি গঠন করে। শহিদ/নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবার এবং পঙ্গু ও আহতদের সহায়তা করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল গঠন করেন। উক্ত ত্রাণ তহবিল হতে ৭৮,০০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে সহায়তা দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এসময় জাতীয় পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়। সম্বলহারা নারী ও শিশুদের পরিচর্যা ও নিরাপত্তার জন্য মহকুমা পর্যায়ে ৬২টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১২ জানুয়ারি মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা গঠন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

ধ্বংসপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি ভবন, যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগসহ সমগ্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা পুনর্নির্মাণ

বঙ্গবন্ধু পুনর্গঠন কাজকে ১০টি সেক্টরে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক সেক্টরের জন্য অর্থ বরাদ্দ

দেন। ১৯৭৪ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল সেতু পুনঃনির্মাণ করেন এবং অতিরিক্ত ৯৭টি নতুন সড়ক সেতু নির্মাণ করেন। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটেও বিমান চালু হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই শিপিং কর্পোরেশন ১৯৭৪ সালের মধ্যে কোস্টারসহ ১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করে। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল বঙ্গবন্ধুর এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ২০০ মেগাওয়াট থেকে ডিসেম্বরে ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেন বঙ্গবন্ধু । সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে দেশব্যাপী পল্লীবিদ্যুৎ কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিগ্রাম ও টেলিফোন বোর্ড গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ৫৫,০০০ টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা করা হয়। বহির্বিশ্বের সাথে টেলি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পাবর্ত্য চট্টগ্রামে উপগ্রহ ভূ-উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়

পুনর্গঠন কর্মসূচি:

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে পুনর্গঠন কাজের জন্য অর্থবরাদ্দ ছিল:

ক্র. নং	খাত	বাজেট বরাদ্দ (দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)	শতকরা হার
১)	পরিবহন যোগাযোগ	৫৫৭.৯৮	৫২.৩১%
২)	বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৯৪.৯০	৮.৯০%
৩)	কৃষি, বন, মৎস্য, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন	১৪৭.৮০	১৩.৮৬%
৪)	শিল্প	৬৫.৭৭	৩.১৭%
৫)	শিক্ষা	৫১.০০	৪.৭৮%
৬)	গৃহ নির্মাণ	৪৭.৮০	৪.৪৮%
৭)	স্বাস্থ্য	৪০.৩০	৩.৭৮%
৮)	সমাজকল্যাণ ও শ্রম	৩২.৪০	৩.০%
৯)	পানি	২০.২০	১.৮৯%
১০)	জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং	৮.৬০	০.৮১%
মোট:		**১,০৬৬.৭৫**	

খাদ্য শস্য উৎপাদন ও খাদ্য সংকট উত্তরণ

বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে ৭৮৬ কোটি টাকার প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন যেখানে কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়। জমির সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফসহ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। পরিবারপিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করা হয়। দখলদার পাকিস্তানি শাসনামলে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে ঋণী কৃষককে মুক্তি দেয়া হয় এবং সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করা হয়। ১৯৭২ সালের শেষ নাগাদ সারাদেশে হ্রাসকৃতমূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০ গভীর নলকূপ ও ৩০০০ অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সনে এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। কৃষকদের মাঝে ১৯৭২ সালেই কেবলমাত্র অধিক ফলনশীল ১৬,১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাট বীজ এবং ১,০৩৭ টন গম বীজ বিতরণ করা হয়। ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি সারের মূল্য মণপ্রতি ছিল যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা। ফলে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার গড়ে ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ব্যবহার গড়ে ৪০ শতাংশ এবং উন্নত বীজ ব্যবহার গড়ে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এসব পণ্যের ন্যূনতম ন্যায্য বিক্রয়মূল্য ধার্য করে দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের মধ্যেই সারাদেশে ১০০টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের আট মাসের মধ্যে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুরোদমে চালুর ব্যবস্থা করেন। ফারাক্কা বিষয়ে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু বিশিষ্ট পানিবিজ্ঞানী বি এম আব্বাসকে ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে দিল্লি পাঠান এবং শুকনো মৌসুমে পদ্মা নদীতে ৫৪,০০০ কিউসেক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করেন। পরবর্তী কোন সরকারই সে লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও যেতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর সময়ে কৃষি বিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়। কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার নামে কৃষকদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

বিপর্যস্ত শিক্ষাকার্যক্রম পুনরুদ্ধার এবং বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান

১ম বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষাখাতে ৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাবিস্তার ও নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ। তিনি একসাথে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেইসাথে ৪৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করেন এবং তাদের চাকরি সরকারিকরণ করেন। পাকিস্তান আমলের প্রাথমিক শিক্ষকদের ১২০ টাকার

বেতন স্কেল স্বাধীন বাংলাদেশে ২২০ টাকা করা হয়। বঙ্গবন্ধু সরকার ২৫ এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করেন। সেসময়ে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই ও গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পোষাক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। নারীশিক্ষার প্রসারে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক, গণমুখী ও যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় এবং উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান প্রণীত অধ্যাদেশ বাতিল করে ১৯৭৩ সালে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) এবং ঢাকায় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারসহ চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আঞ্চলিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন যা বর্তমানে দেশের বৃহত্তম বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু জাতীয় আশা- আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে, বাঙালির হাজার বছরের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ধরে রেখে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গঠন করেন যা বাংলাদেশের শিল্প- সংস্কৃতি বিকাশে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু দুঃস্থ শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের কল্যাণার্থে সরকারিভাবে 'বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' গঠন করেন। ১৯৭৫ সালে গঠন করেন 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন'। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যে ধর্মহীনতা নয় এ উপলব্ধি থেকেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি পাচ্ছে

জনমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সৃষ্টি

স্বাস্থশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে শাহবাগ হোটেলকে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ (IPGMR)-এ রূপান্তর করেন যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। ১৯৭২-এর ৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তৎকালীন আইপিজিএমআরে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ ও নতুন মহিলা ওয়ার্ড উদ্বোধন করেন। সেসময় বাংলাদেশে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসার জন্য বারডেম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গবন্ধু সরকার নগরভিত্তিক ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিকভাবে ৫০০ চিকিৎসককে গ্রামে নিয়োগ করেন। তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসনিক সংস্কার

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত ছিল), প্রাদেশিক সরকারের কাঠামো এবং সাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের ছোট কাঠামো-এই ৩টি কাঠামোর একত্রীকরণ করে একটি জাতীয় ও পূর্ণাঙ্গ সরকার কাঠামো গঠনের কাজটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭২ সালে ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর গঠিত হয় বেসামরিক প্রশাসন পুনর্বিন্যাস কমিটি। বঙ্গবন্ধু একটি আধুনিক ও শক্তিশালী জনপ্রশাসন গঠনের সকল পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ লক্ষ্যে তাঁর শাসনামলে (১৯৭২-৭৫) গঠিত হয়েছিল প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিটি ১৯৭২ এবং জাতীয় বেতন কমিশন ১৯৭৩

এসব কমিটির রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল

- একটি একক শ্রেণিবিহীন গ্রেডকাঠামোর আওতায় সব সরকারি চাকরিকে ১০টি গ্রেডে বিন্যাস করা; নতুন দশটি স্কেলে সর্বনিম্ন মূল বেতন ১৩০ টাকা ও সর্বোচ্চ মূল বেতন ২,০০০ টাকা নির্ধারিত হয়, যার আনুপাতিক হার হলো ১:১৫.৩৮। পূর্বেকার বাতিলকৃত বেতন স্কেলে এ আনুপাতিক হার কয়েকগুণ বেশি ছিলো।
- নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারে ক্ষমতা প্রত্যর্পণসহ জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়া।
- কমিটির সুপারিশে মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ২২ জুন ১৯৭৫ তারিখে দেশের ৬০টি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করার ঘোষণা দেয়।
- ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বাংলাদেশ আইন কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়। সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করার জন্য এ পদসমূহ সৃষ্টি করা হয়।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। ১১ মার্চ ১৯৭৪ তারিখে তিনি কুমিল্লায় বাংলাদেশের প্রথম সামরিক একাডেমি উদ্বোধন করেন। ০৬ মার্চ ১৯৭২ তারিখে তিনি বিডিআর গঠনের আদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু ০৮ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

মানুষে মানুষে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবিচার দূরীভূত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে আইন করে ৪'শ টি ব্যাংক-বীমা-পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ করেন বঙ্গবন্ধু। শিল্পখাতের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার দীর্ঘমেয়াদী শিল্পঋণ প্রদানের নীতিমালা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা ও বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন; এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ১০৫০টি নতুন শাখা স্থাপন করেন। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে-এর ৩৩৫টি শাখা স্থাপন করেন। গ্রাম বাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP)-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে চাকরির সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য তিনি ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনি ড. নীলিমা ইব্রাহীমকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং মিসেস বদরুনেসা আহমেদ ও বেগম নূরজাহান মুরশিদকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

দেশের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) গঠন করেন। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যায্যমূল্যে দ্রব্য ক্রেতার নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজও করত টিসিবি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য জ্বালানি নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ মিনারেল, এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড গ্যাস কর্পোরেশন (BMEDC) এবং খনিজ তেল ও গ্যাসখাতকে নিয়ে বাংলাদেশ ওয়েল অ্যান্ড গ্যাস কর্পোরেশন (BOGC) গঠন করেন। ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিশ্বখ্যাত শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে তাদের মালিকানাধীন এ দেশের পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ও তিতাস গ্যাস কোম্পানির শেয়ার নামমাত্র মূল্যে ৪.৫০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং-এ ক্রয়চুক্তি করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসেন যা বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি মাইল ফলক।

দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের নিয়ে তিনি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করলেন। কমিশনের সহায়তায় দেশের অর্থনীতি নতুন করে গড়ে তুলতে ১৯৭৩ সালে ৪ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকার প্রথম পাঁচসালা বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৫ সালের জুন মাস নাগাদ দেশের অর্থনীতিতে মোটামুটি একটা স্থিতিশীলতার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯৩৭.৭৬ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ৮১৪.৩৩ কোটি টাকায় নেমে আসে এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১১১.৪৯ কোটি টাকা থেকে ৩৫০.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিলো

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও দেশগুলো বাংলাদেশের ব্যাপারে নেতিবাচক হয়ে উঠতে পারে। ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) ৩৮.৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ৩০ কোটি টাকার পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বাংলাদেশে সাড়ে ১৫ লাখ মণ খাদ্য শস্য মঞ্জুর করে। বিশ্বব্যাংক ১৫ কোটি ডলার ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ব্যাংকটি কনসোর্টিয়ামভুক্ত দেশগুলোকে বাংলাদেশে ১২০ কোটি ডলারের সাহায্য ঋণ প্রদানের আবেদন জানায়। ব্রিটেন এবং বেলজিয়াম ২৫ জুন তারিখে বাংলাদেশের জন্য পণ্য ও ঋণ সাহায্য মঞ্জুর করে। ফলে, পশ্চিমা দেশগুলোসহ চীন, জাপান, প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা লাভ এবং দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা নতুনভাবে শুরু করার সুযোগ পায়।

পররাষ্ট্রনীতি এবং বঙ্গবন্ধুর অর্জন

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সকলের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা। সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যেই (১৪ মার্চ ১৯৭২) তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ০৪ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রচেষ্টায় ১০ মে ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ তারিখে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর দক্ষ কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে ১২১টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে উন্নত করেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে অতি অল্প সময়ে তিনি আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশ্বশান্তি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭২ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদের জুলিও কুরি শান্তি পদক দেয়া হয়।

পরিশেষে কবির ভাষায় বলা যায় –

বংশীবাদক বঙ্গবন্ধু
হারিয়ে গেছে ঠিক

সঞ্জীবনী বাঁশীর সে সুর

বাজছে সুনির্ভীক।

পার্থিব অনুপস্থিতি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর সঞ্জীবনী বাঁশীর সুর কোনদিন থামিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে আমরা এ সুরের সাধনায় ব্রতী হলেই এ মহামানবের স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা পাবে; প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের অধিকার এবং জয় হবে মানবতার।

দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান

কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ [১২]

আমি এই আলোচনায় প্রথমে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ও উন্নয়ন দর্শন সম্বন্ধে কিছু কথা বলব। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশে শুরুর দিকে বাস্তবতা কেমন ছিল এবং তিনি কিভাবে বিরাজমান সেই কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সচেষ্ট হোন এবং দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়নে অবদান রাখেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও উন্নয়ন দর্শন

মানুষই বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও উন্নয়ন দর্শনের মূল উপজীব্য। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আপনার শক্তি কী? উত্তর: আমি আমার দেশবাসীকে ভালবাসি। পরবর্তী প্রশ্ন: আপনার দুর্বলতা কী? উত্তর: আমি তাদেরকে অত্যধিক ভালবাসি।

তিনি চেয়েছিলেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। চেয়েছিলেন বৈষম্য শোষণ ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে। সকল বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে আপামর জনসাধারণ যাতে উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে পারে সেই পথ তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি ধান্দাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের নির্মুল করতে চেয়েছিলেন। মানুষের আত্মশক্তির উপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল—তাই ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণে প্রত্যয়ের সঙ্গে অবলীলায় বলতে পেরেছিলেন 'সাত কোটি বাঙালিকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। ঐ ভাষণে তিনি আরো বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জিত হয়েছে- আমাদের একটি ভূখন্ড আছে, একটি মানচিত্র আছে, একটি পতাকা আছে। তবে মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত আছে। এই সংগ্রাম হচ্ছে ক্ষুধামুক্ত শোষণমুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক সাম্য ভিত্তিক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। আমরা যদি আওয়ামী লীগের ১৯৭০এর নির্বাচনী ইশতেহারের দিকে তাকাই তাতেও দেখা যাবে দুঃখী মানুষের মুক্তির কথা বলা হয়—সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন দূর করে অধিকার ভিত্তিক ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের কথা বলা হয়।

১২ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন

বিজয়ের পর দেশে বিরাজমান বাস্তবতা

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের সব খাতে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলে এবং সার্বিকভাবে দেশ ভগ্নদশায় নিপাতিত হয়। বিজয়ের পর যে অবস্থা বিরাজ করছিল তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো। কৃষি শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতির সব খাত বিধ্বস্ত ও স্থবির; এক কোটির অধিক নি:স্ব মানুষ ভারত থেকে ফিরে আসেন; যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত; অকার্যকর আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা; ভঙ্গুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা কোনো প্রতিষ্ঠানই কাজ করছিল না; দারিদ্র্যের হার ৮০ শতাংশের অধিক; কর্মসংস্থান অতি সীমিত অর্থাৎ বেকারত্ব সর্বগ্রাসী; কার্যত অচল কৃষিখাত সার, বীজ, চাষের গরু বা যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা; স্থবির শিল্পখাত; সমস্যা জর্জরিত পাট ও পাটজাত পণ্য নির্ভর রপ্তানি খাত; বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য স্থিতি; পরিকল্পনা তৈরির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি বা অচলাবস্থা।

এক কঠিন সমস্যা-সংকুল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। উত্তরণ ছিল আশার আলো বিবর্জিত। বঙ্গবন্ধু দমে যান নি। বাস্তবতার আলোকে সাহসিকতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। পথ দেখালো তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং দেশের মানুষের উপর আস্থা।

তখনকার বাস্তবতায় প্রধান প্রধান করণীয়

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য করণীয়গুলোর মধ্যে ছিল:

- ভারত থেকে ফিরে আসা এক কোটি মানুষ এবং দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধের সময় নি:স্ব হওয়া অনেক মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুনর্বাসন;
- দেশের ৮০ শতাংশ বা ততধিক মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত হওয়া অর্থনীতির পুনর্বাসন ও পুনর্জাগরণ;
- যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্গঠন;
- স্বাধীন দেশের উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা বা পুনর্বিন্যাস করা। যথা: আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক, বিচারিক, আইন-শৃঙখলা, অর্থনীতি পরিচালনা, আর্থ-সামাজিক নীতিনির্ধারণী, ব্যাংকিংসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গনে যথাযথ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন । বিভিন্ন রাষ্টের স্বীকৃতি অর্জন এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভ।

এসকল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আশু করণীয় সম্পাদনে বঙ্গবন্ধু গভীর প্রত্যয়ে মনোনিবেশ

করলেন। দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিক এখানে তুলে ধরা হলো।

অবকাঠামো পুনর্বাসন

বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেন যে, সঙ্গত কারণে অর্থনৈতিক-সামাজিক পুনর্বাসন ও পুনর্জাগরণে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তিনি বিধ্বস্ত সেতু, কালভার্ট, রাস্তাঘাট পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ নজর দেন। দ্রুত যথেষ্ট উন্নতি করা সম্ভব হয়। ফলে বিভিন্ন খাতের, বিশেষ করে কৃষি খাতের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করে।

খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস

ভারত থেকে ফেরত আসা এবং অন্যান্য দরিদ্র কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়, যাতে তারা সুলভে এসকল দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারেন।

যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন দেশের ৯২ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করতেন। তারা মূলত কৃষি নির্ভর ছিলেন অধিকাংশ সরাসরি কৃষিতে এবং অন্যরা কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত ছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রধান খাত হিসাবে কৃষিকে চিহ্নিত করলেন। সঙ্গত কারণে তিনি মনে করতেন কৃষি মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত অর্থনীতির উত্তরণ ও উন্নয়নের মূল ভিত। তখন জাতীয় উৎপাদের (জিডিপি) ৬০/৭০ শতাংশ কৃষি থেকে আসত এবং দেশে কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস ছিল কৃষি।

কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (যা পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। পাশাপাশি কৃষি খাতকে সহায়তা করার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (১৯৭২), তুলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৭২), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (১৮৭৩), মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (১৯৭৩), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (১৯৭৪) এবং ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান (১৯৭৪)।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত কৃষি খাতের পুনর্বাসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথম দফায় (২৩ জানুয়ারী ১৯৭২) ১৬ কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ ঘোষণা করা হয়; পাকিস্তান আমলে কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করা হয়; সব বকেয়া খাজনার সুদ মওকুফ করা হয়; ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির

উপর খাজনা মওকুফ করা হয়; কৃষকদেরকে ১০ কোটি টাকা তাকাবি ঋণ ও ৫ কোটি টাকা সমবায় ঋণ দেয়া হয়; যথেষ্ট পরিমাণে বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; এবং হ্রাসকৃত বা ক্ষেত্র বিশেষ বিনামূল্য কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি, ভূমি সংস্কারেরও উদ্যোগ নেন বঙ্গবন্ধু পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা জমির সিলিং নির্ধারণ করা হয়। বিধ্বস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত কৃষি অর্থনীতিকে আবার চালু করা এবং খাতটির পুনর্জাগরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়। এভাবে বাস্তবতার সঠিক মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বঙ্গবন্ধুর দুরদর্শিতার পরিচয় মিলে।

তিনি কৃষিকে ব্যাপক আঙ্গিকে বিবেচনা করতেন। অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় চাল, শাক-সবজি, হাঁস-মুরগি, গরু ও ছাগল উৎপাদনে গুরুত্ব দেন। ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ তারিখে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভষণে বলেন যে, খাদ্য শুধু চাল, আটা, ময়দা নয়। শাক-সবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি সব মিলিয়ে খাদ্য, সুষম খাদ্য। এই সব কিছুর উৎপাদনে ও বন্টনে নজর দেয়ার কথা বলেন তিনি।

১৯৭৪ সালে ভোক্তা পর্যায়ে দেশের কয়েকটি অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য গুরুতর কারণে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ মারা যায়। এই অবস্থা মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিরাজমান ছিল, তবে নভেম্বর মাস নাগাদ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। এর অভিঘাত সীমিত রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু সম্ভাব্য সব কিছু করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সংকটটি বহুলাংশে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় ঐ বছর দেশে মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্তি ঐ দশকের আগের বছরগুলো এবং পরের কয়েকটি বছর থেকে বেশি ছিল। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় উপর্যোপরি বন্যার ফলে অধিক বন্যাকবলিত তদানীন্তন রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলায় খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। একদিকে আয় কমে যায় এবং অপরদিকে চালের দাম বেড়ে যায়। মানুষের খাদ্য সংকট বাড়তে থাকে। দেশে প্রাপ্ত খাদ্য থেকে এই সংকট মোকাবিলা করা যেত। কিন্তু মজুদদাররা অধিক মুনাফার লোভে চাল গুদামজাত করে রাখে সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে। এছাড়া, অতি বৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট দুর্গম হওয়ার কারণে যতটুকু চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে সময়মত পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের কাছে খাদ্য পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাফিলতি ছিল। চাল গুদামজাত করে বাজারে চাল সরবরাহে সংকট সৃষ্টি করায় চালের দাম আরো বেড়ে যায়। অবস্থার আরো অবনতি হয় যখন কিউবার কাছে বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্য বিক্রি করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাঝ পথ থেকে বাংলাদেশের জন্য খাদ্য বহনকারী জাহাজ ফিরিয়ে নেয়। এই

পরিস্থিতিতে মজুতদাররা আরো অধিক মুনাফার হাতছানি দেখে এবং কঠোরতর মজুতদারিতে সক্রিয় হয়ে উঠে। ফলে বাজারে খাদ্য সরবরাহ আরো সংকুচিত হয়। বন্যাকবলিত দুর্দশায় নিপাতিত মানুষদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় মূলত মজুতদারি, বিধ্বস্ত রাস্তাঘাটের কারণে খাদ্য পৌঁছানোয় বিঘ্ন ঘটা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মাঝ পথ থেকে খাদ্যবাহী জাহাজ ফিরিয়ে নেয়া জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্তিতে ব্যাপক ঘাটতির জন্য নয়। ধারণা করা যায় এটি আরো একটি কারণ যে জন্য বঙ্গবন্ধু দুর্নীতিবাজ, ধান্দাবাজ ও মজুমদারদের নির্মুলে কঠোরভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন।

যুগান্তকারী সমবায় দর্শন

প্রাথমিকভাবে স্থবির হয়ে যাওয়া কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক খাত চালু করা ও যাতে সার্বিকভাবে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেই ব্যবস্থা করার পর দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক বিকাশের রূপরেখা ও নীতি কৌশল নির্ধারণে মনোযোগ দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দারিদ্র্য বিমোচন এবং কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে বহুমুখী সমবায় দর্শন গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে (২৬ মার্চ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক ভাষণে বলেন: 'গ্রামের প্রত্যেকটি কর্মঠ মানুষ এই বহুমুখী সমবায়ের সদস্য হবে। যার যার জমি সেই চাষ করবে। কিন্তু ফসল ভাগ হবে তিন ভাগে কৃষক, সমবায় ও সরকার। কৃষকের জমি নিয়ে নেয়ার কথা তিনি বলেননি যৌথ চাষের কথা বলেছেন। এই সমবায়ের কাছে উন্নয়ন বাজেটের অংশ তুলে দেয়া হবে বলেও তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, 'এরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে ..... টাউটদের বিদায় হবে।'

এই সমবায় গ্রাম ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা করার কৌশল নির্ধারণ করা হয়। পুরো গ্রামের একটি সমবায়ের অধীনে আনার কথা তাঁর ভাবনায় ছিল। গ্রাম তহবিলের কথা তিনি ভেবেছিলেন এই তহবিল গঠিত হওয়ার কথা ছিল উৎপাদিত ফসলের এক অংশ এবং সরকারি বরাদ্দ সমন্বয়ে। কিন্তু এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তৈরি করার সময় তিনি পাননি বাস্তবায়ন দূরে থাক।

উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত এই সমবায় ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল-এর একটি অপরিহার্য অর্থনৈতিক কর্মসূচি। আমি বাকশালের রাজনৈতিক আঙ্গিক নিয়ে কোনো কথা বলব না কারণ রাজনীতি আমার বিষয় নয়। তবে এই সমবায় কর্মসূচি ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধুর অগ্রসর চিন্তার ফসল ছিল। বাস্তবায়িত হলে দেশ অনেক আগে অনেক এগিয়ে যেত। উন্নয়ন অর্থায়নে বিদেশ নির্ভরতা ঐসময়েই অনেক কমে যেত। আমার বিবেচনায় প্রস্তাবিত সমবায় পদ্ধতিতে সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে জন-উদ্যম বৃদ্ধির ফলে উন্নয়ন

তরান্বিত হতো, যে উন্নয়ন হতো অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ফলে জনকল্যাণকর উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হতো। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের পর এই কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টি পরবর্তীতে আর মূল্যায়ন করা হয়নি।

শিল্প উন্নয়ন

একটি অর্থনীতিকে উন্নত করতে হলে কৃষিসহ অন্যান্য খাত, বিশেষ করে শিল্প উন্নয়নে নজর দিতে হবে এই চিন্তা থেকে বঙ্গবন্ধু ১৯৭০-এর নির্বাচনী ইশতেহারে শিল্প বিকাশের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন। স্বাধীনতার পর তিনি বড় বড় শিল্প জাতীয়করণের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ছোট ছোট শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বিকাশে নজর দেন। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনকে কার্যকর করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে এই করপোরেশন থেকে আলাদা করে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়া হয়। কেননা এসকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হবে এবং তারা নিজেদের জীবনমানে উন্নতি ঘটাতে পারবেন। তাই প্রাথমিকভাবে জাতীয়করণকৃত ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একই সাথে 'নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ১৯৭৪' বেসরকারি বিনিয়োগ সর্বোচ্চ সীমা প্রথমে যে ২৫ লাখ করা হয়েছিল তা থেকে বৃদ্ধি করে তিন কোটি টাকা করা হয়।

পাকিস্তান আমলে বড় শিল্পগুলো (পাট, বস্ত্র, চিনি, ইস্পাত, সার, রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্প, অন্যান্য) এবং ব্যাংক ও বীমাসহ সব বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এগুলোর অধিকাংশ পাকিস্তানীদের মালিকানায় ছিল। এই মালিকরা এবং যে সকল পাকিস্তানী দক্ষ ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও উৎপাদন-বিপণন কর্মী এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন তারা চলে যান। ফলে এসকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। চলতি মূলধন এবং কোনো কাঁচামালও ছিল না। এগুলোতো বটেই পাশাপাশি বাঙালি মালিকানায় থাকা এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোও জাতীয়করণ করা হয়। এই পদক্ষেপ ১৯৭০-এ নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী নেয়া হয়। পাকিস্তান আমলে বেসরকারি মালিকানায় থাকলেও এসকল প্রতিষ্ঠান প্রধানত সরকারি আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় মোট বিনিয়োগের মাত্র ২৪ শতাংশের মত খরচ করেই একজন এরকম একটি প্রতিষ্ঠানর মালিক হতে পারতেন। বঙ্গবন্ধুর বিবেচনায় সরকারি খরচে বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসা চালানো ন্যায়সঙ্গত নয়।

জাতীয়করণকৃত বিভিন্ন শিল্প ও উদ্যোগের ব্যবস্থাপনা প্রাথমিকভাবে খাতভিত্তিক ১০টি করপোরেশনের হাতে ন্যস্ত করা হয়। যথা : পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প, সার, রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্প, কাগজ বোর্ড, চামড়া, ইস্পাত শিল্প, প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ, খনিজদ্রব্য তেল ও

গ্যাস এবং বন পণ্য করপোরেশন। পরবর্তীতে প্রাথমিক অভিজ্ঞতার আলোকে এক-দুই ক্ষেত্রে একত্রীকরণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর শিল্পনীতির মূল একটি উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে এরকম ছিল যে দেশে সমাজতান্ত্রিক ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বড় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জাতীয়করণের মাধ্যমে এগুলোতে ন্যায্য জন-অধিকার নিশ্চিত করা এবং অপরদিকে ছোট ছোট শিল্প-ব্যবসায় সাধারণ মানুষের সম্পৃক্তির মাধ্যমে তাদের উদ্যোগ-আগ্রহ উৎসাহিত করে দেশের দারিদ্র নিরসন ও উন্নয়নে তাদের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা, দক্ষ জনবলের অভাব, আদর্শিক সহযোগীর ঘাটতি এবং দুর্নীতির বিস্তারসহ বিরাজমান প্রতিকুল বাস্তবতা এবং যে স্বল্প সময় তিনি পেয়েছিলেন তাতে সেই লক্ষ্য এগিয়ে চলার উপযুক্ত কাঠামো ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আর ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট তাঁকে নির্মমভাবে হত্যার করার পর অর্থনৈতিক ও সমাজিক বিবর্তন ভিন্ন স্রোতে অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথে দ্রুত চলতে শুরু করে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন

বঙ্গবন্ধু তাঁর মানুষ কেন্দ্রিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নকল্পে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। যাতে সঠিক পথ রচনা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। তাই তিনি একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ার লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করার দায়িত্ব দেন। দিক-নির্দেশনা আসে তাঁর কাছ থেকে।

এই পথে এগিয়ে চলার জন্য অর্থাৎ সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষের যে প্রয়োজন তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিদগ্ধ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষ মানুষ গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য ড. কুদরত-ই- খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশন প্রতিবেদন দিয়েছিল বটে, তবে কাঙ্খিত পথে এগিয়ে যেতে পারলেন না, ঘাতকরা তাঁকে সেই সুযোগ থেকে নির্মমভাবে চিরতরে বঞ্চিত করল।

উপসংহার

অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চিন্তাভাবনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য তাঁর অর্জন সম্বন্ধে আমাদের ভাল করে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে যথাযথভাবে সচেষ্ট হতে হবে। শুধু কোনো বিশেষ দিনে বা সময়ে বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে আলোচনা করা বা শোনাই যথেষ্ট নয়। তাঁর আদর্শের আলোকে যার যার অবস্থান থেকে

আমাদেরকে কাজ করতে হবে, তবেই দেশের সাধারণ মানুষের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারব এবং তাঁর প্রতি প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধা জানাতে পারব।

বঙ্গবন্ধু ও সিভিল সার্ভিস

এইচ টি ইমাম [১৩]

প্রারম্ভিকা:

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। এই মহান অর্জনে যার অবদান সর্বময় ও অসামান্য, তিনিই হচ্ছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি তাঁর কৌশলগত নেতৃত্ব (Strategic Leadership) দিয়ে কখনও জনগণের মাঝে থেকে, কখনও কারান্তরাল থেকে, জাতিকে তার মূল লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করেছেন। তিনি এই রাষ্ট্রের স্থপতিও। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নতুনভাবে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা আইন নেই যা তিনি সৃষ্টি করে যাননি। তিনি একাধারে সফল রাষ্ট্রনায়ক ও সুদক্ষ প্রশাসক। জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ।

পাকিস্তান আমলের বৈষম্যমূলক সিভিল সার্ভিস:

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৬৫ - ১৮৫৮) এবং পরে ব্রিটিশ রাজের (১৮৫৮-১৯৪৭) উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন ও পরিবেশ- পরিস্থিতি থেকে। দেশ ভাগের পর ব্রিটিশ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এর ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রযন্ত্র সচল রাখতে প্রতিষ্ঠা করা হয় সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান। কিন্তু কতিপয় অভিজাত পরিবার, সামরিক বাহিনী ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত পাকিস্তান সরকার তাদের হীন মনোবাসনা চরিতার্থ করার জন্য সিভিল সার্ভিসকে কলুষিত করে নানাভাবে। এ সময় সিভিল সার্ভিসে আঞ্চলিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে ।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সব উচ্চ পদে পশ্চিম পাকিস্তানীদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২ হাজার কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৯০০। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে ৯৫৪ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ১১৯ জন। ১৯৬৬ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গেজেটেড কর্মকর্তা ছিলেন যথাক্রমে ১,৩৩৮ এবং ৩,৭০৮ জন এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ছিলেন যথাক্রমে ২৬,৩১০ ও ৮২,৯৪৪ জন। ১৯৬২ সালে ফরেন সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ২০.৮%।

১৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা

বিদেশে ৬৯ জন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে ৬০ জনই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। এমনকি, ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত একজন বাঙালিও সচিব ছিলেন না; যুগ্ম সচিব ছিলেন কেবলমাত্র ০৩ জন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের অবদান:

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের দেশপ্রেমিক বাঙালি সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ ও বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করতেন। আর এই বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণ থেকে উত্তরণের বহি:প্রকাশ ঘটে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফায়। বাঙালিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভীত পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এ মামলায় ০৩ (তিন) জন সিএসপি কর্মকর্তা আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও খান মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে আসামী করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মোতাবেক ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনে শামিল হয়ে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তারা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেন। শুরু হয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল-রাতে উন্মাদ পাকিস্তান বাহিনীর বর্বর কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ই.পি. আর.-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত বাণী পৌঁছার সাথে সাথে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ; আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তথা জনযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন আমাদের ব্যাচের নূরুল আমিন খান সি.এস.পি., কর্মকর্তা শামসুল হক খান সি.এস.পি., (কুমিল্লার ডি.সি.), সি.এস.পি. শামসুদ্দীন, রাঙামাটি সদরের এস.ডি.ও. আবদুল আলী প্রমুখ। ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ শহীদ এবং আহত হন। রাজশাহীর রেঞ্জ ডি.আই.জি. মামুন মাহমুদ, রাজশাহীর এস.পি. শাহ আবদুল মজিদ, চট্টগ্রামের এস.পি. শামসুল হক সহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন । এছাড়া, চট্টগ্রামে শহীদ হন দুজন উচ্চপদস্থ প্রকৌশলী; একজন চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান প্রকৌশলী এবং আরেকজন পূর্বাঞ্চল রেলের প্রকৌশলী। আরও শহীদ হন কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দীন।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ এমএনএ ও এমপিএ-গণ ভারতের সীমান্তবর্তী এক গোপন স্থানে মিলিত হয়ে গণপরিষদ গঠনপূর্বক পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। একইসাথে

গঠন করা হয় প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যার ভিত্তি ছিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা Proclamation of Independence। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে আনুষ্ঠানিকভাবে **'রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা'** হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয়। এই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, সেহেতু ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকেই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা কার্যকর হবে। একই সাথে আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য Laws Continuance Enforcement Order, 1971 জারি করা হয়। এই সময় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়, যিনি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামানকে মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিবর্গের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হয়েছিল। সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ, দক্ষ, কর্মঠ, স্বাধীনতার চেতনায় দীপ্ত নতুন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। মন্ত্রিসভার সব সদস্য সরকারি প্রশাসনকে সচল রাখতে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বাধীনতার জন্য যে অবদান রেখেছেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ সময় বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য ১২টি মন্ত্রণালয় এবং ১১ টি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের জন্য নিবেদিত প্রাণ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সংখ্যা ছিল বিপুল। কিন্তু এর মধ্যেও স্বাধীনতা বিরোধী কিছু লোক ঘাপটি মেরে ছিল।

আঞ্চলিক পরিষদ এবং দপ্তরগুলো থাকার ফলে দেশ সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হবার আগেই সরকারের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। সেকারণে ১৬ ডিসেম্বরেই বা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তার আগেই নিয়োগকৃত সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা স্ব-স্ব পদে যোগদান করে কালবিলম্ব না করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সরকার পরিচালনার দর্শন:

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই বঙ্গবন্ধু দিনান্ত পরিশ্রম করেছেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে এমন একটি রাষ্ট্র এবং সরকারের কাঠামো স্থাপন

করার জন্য যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে শোষিতের গণতন্ত্র। দক্ষ রাজনীতিবিদ এই মহান নেতা একজন পরিপক্ক প্রশাসকের ন্যায় নির্বাহী, আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি দেশের কল্যাণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুসমন্বিতভাবে পুনর্গঠনের জন্য সিভিল সার্ভিসকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাতির পিতা এবং রাষ্ট্রের স্থপতি সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা নিয়ে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সরকারের গৃহীত চারটি মূলনীতি (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা) এবং জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসাই ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পুনর্গঠনের প্রধান প্রেরণাদায়ী স্তম্ভ।

বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনা:

বঙ্গবন্ধু সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ তারিখে তাঁর সরকারি বাসভবনে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর /বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর প্রধানদের নিয়ে এক সভা করেন; এ সময় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সবকিছুর উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন,

"অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ৯ মাসে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর হাতে এ দেশের লাখো জনতা অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছে। জনগণের আত্মত্যাগের কোন তুলনা নেই। বর্বরদের নির্যাতন থেকে এ দেশের একটি পরিবারও রেহাই পায়নি। বাংলাদেশের আদর্শকে রক্ষা করার জন্য জনগণ সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। এতকিছুর পর অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। এই স্বাধীন জাতির প্রতি সরকারি কর্মচারীদের রয়েছে এক নতুন দায়িত্ব। সরকারি কর্মচারীদের অবশ্যই এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন:

"আমি চাই যে, আপনারা এই মায়ের, বাংলা মায়ের সন্তান হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের সেবা করবেন। আপনারা সেবক, আপনারা শাসক নন। আমি আপনাদের আবেদন করবো, আমি আপনাদের নির্দেশ দেবো, আমি আপনাদের অনুরোধ করবো, এ দেশের প্রত্যেকটা মানুষ আপনার ভাই, আপনার মা, আপনার বোন, আপনার বাপ। প্রাণ ভরে তাদের সেবা করতে হবে, সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে।" (গণভবনে নির্বাচন উপলক্ষে সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, তারিখ: ১০-০২-১৯৭৩)

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমোঘ নির্দেশনা:

"জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজন। মনে রেখো, জনগণ কারা? তোমার বাপ, তোমার ভাই। তোমাদের যে মাইনা আসে কোত্থেকে আসে? সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী যারা এখানে আছেন তাদের সকলের বেতন আসে বাংলার দুঃখী মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়া। তোমরা তাদের মালিক নও। তোমরা তাদের সেবক। তাদের অর্থে তোমাদের সংসার চলে। তাদের শ্রদ্ধা করতে শেখো। তাদের ভালবাসতে শেখো। নিশ্চয়ই যেখানে অন্যায় হবে সেখানে দমন করবা। কিন্তু নিরপরাধ লোকের উপর যেন অন্যায় না হয় এদিকে খেয়াল রেখো। (বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ১ম ব্যাচের জেন্টেলম্যান ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ। ভাষণ প্রদানের তারিখ: ১১-০১-১৯৭৫)।"

সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনা:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না; তিনি একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সত্যিকার স্থপতি ছিলেন। একদিকে রাষ্ট্র পরিচালনা অন্যদিকে একটি গণমুখী প্রশাসন স্থাপনও করে গিয়েছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে সরকারের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারি ব্যাপক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের এবং যুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে থেকে যেসব বাঙালি দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা-কর্মচারি বাংলাদেশের প্রতি অনুগত ছিলেন তাদের সকলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু তার নেতৃত্বাধীন সরকার পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, প্রশাসন-ব্যবস্থা সবই বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। যুদ্ধ শেষে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তার গঠিত সরকার নিয়ে। তিনি হিমালয় পর্বতের মতো অটল থেকে দেশের সব সমস্যা মোকাবিলা করতে প্রশাসন-ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাবেক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে স্বাধীন দেশের জাতীয় কেন্দ্রীয় কাঠামো হিসেবে দ্রুত রূপান্তর করার পাশাপাশি জেলা কাঠামো পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ নেয় বঙ্গবন্ধুর সরকার। এই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত এমনকি পাকিস্তান প্রত্যাগতদেরও যথাযোগ্য মর্যাদায় বহাল করা হয়েছিল। তাদের চাকুরির ধারাবাহিকতাও অব্যাহত রাখা হয়। দেশের প্রশাসন-ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থাও বঙ্গবন্ধুর সরকার গ্রহণ করেছিল। একই সাথে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে পৃথকভাবে নির্বাহী (সরকার), সার্বভৌম সংসদ, স্বাধীন বিচার বিভাগ

এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ জারি এবং নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। রাষ্ট্রের পরিচালনার কার্যপদ্ধতি (Rules of Business) ও কার্যবন্টন (Allocation of Business) প্রণয়নও করেন। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বিশেষ কৃতিত্ব ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। সেই সাথে পুলিশ এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আধুনিকায়ন করেছিলেন।

সরকারের কার্য পরিধির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ২০টি মন্ত্রণালয় এবং সাংবিধানিক দপ্তর যথা, সরকারি কর্ম কমিশন, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ও তা বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় সরকারী সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু পূর্ববর্তী মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করে কার্যকরী প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা সংশ্লিষ্টদের নিকট পৌছে দেয়া ও পরবর্তীতে বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সব সময় নিয়োজিত ছিল তাঁকে ঘিরে থাকা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একঝাঁক দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রধানমন্ত্রীর সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরী, অর্থসচিব প্রথমে কফিল উদ্দিন মাহমুদ ও পরবর্তীতে মতিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব মনোয়ারুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর সাথে একান্ত সচিব হিসেবে পর্যায়ক্রমে কর্মরত ছিলেন নুরুল ইসলাম অনু, মাহে আলম, মশিউর রহমান, ফরাসউদ্দীন; তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাক্তন সি.এস.পি কর্মকর্তা। এসময় নিবন্ধকারের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ছিলেন যুগ্মসচিব হাবিবুল হক।

সিভিল সার্ভিসে বঙ্গবন্ধুর অনন্য সাধারণ অবদান:

বেসামরিক প্রশাসন পুনর্বিন্যাস কমিটি:

বঙ্গবন্ধুর সরকার চাকুরি পুনর্বিন্যাস তথা প্রশাসন-ব্যবস্থা সুসংহত করার আগে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন বিভাগ কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর জি.এ. ৪/৪১৭/৭১-১৫৭৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন দ্বারা এম.এম. জামানকে চেয়ারম্যান করে বেসামরিক প্রশাসন পুনর্বিন্যাস কমিটি (Civil Administration Restoration Committee) গঠন করা হয়। এই কমিটিকে সরকারের বিভিন্ন স্তরের বেসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা পুনর্বিন্যাসকরণ এবং তৎকালীন পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আত্তীকরণ এবং সাবেক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রণালয়/দপ্তরের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের একত্রীকরণের উপায় ও পন্থা সম্বন্ধে সুপারিশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটি

১৯৭২ সালের ০৪ জানুয়ারি বেসামরিক প্রশাসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রথম অংশ সরকারের নিকট পেশ করেছিল।

কোন মন্ত্রণালয়ের কাঠামো ও কার্যপ্রণালী কেমন ও কীরকম হতে পারে তার বিস্তৃত বিবরণ এবং রূপরেখা উক্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল। সাবেক পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দফতরগুলি কোন উপায়ে কীভাবে সমন্বিত হতে পারে তার সামগ্রিক উপায় এবং পন্থার বিষয় এই কমিটি প্রতিবেদনে দিয়েছিল। সমন্বয়ের উপায় ও পন্থার কারণগুলোরও ব্যাখ্যা প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবেদনের সঙ্গে একটি সার-সংক্ষেপও দেওয়া হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের বেসামরিক প্রশাসনযন্ত্র হওয়া উচিত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রের নীতির উপর ভিত্তি করে। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত কিছু নীতি এবং সাবেক পাকিস্তান আমলের প্রশাসনযন্ত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আস্থার আবহ প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছিল।

প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্বিন্যাস কমিশন:

দেশের বেসামরিক প্রশাসন কাঠামোয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালের ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্বিন্যাস কমিশন গঠন করে। বিদ্যমান বিভিন্ন টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল পদ ও চাকুরির কাঠামো পর্যালোচনাপূর্বক সরকারের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং আবশ্যকতার নিরীখে ভবিষ্যৎ কাঠামো সম্বন্ধে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকুরী ব্যতীত অন্য সব ধরনের বেসামরিক চাকুরিকে সমন্বিতকরণের উপায় সম্বন্ধে সুপারিশমালা প্রণয়নের দায়িত্ব এ কমিশনকে প্রদান করা হয়। নতুন চাকুরি-কাঠামোয় সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং চাকুরী ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা নির্ধারণের দায়িত্বও কমিশনের উপর বর্তায়। সরকারের বিভিন্ন স্তরের চাকুরিতে ভবিষ্যতে নিয়োগের নীতিমালায় শিক্ষাগত ও চাকুরীর অন্যান্য যোগ্যতা নির্ধারণের দায়িত্ব কমিশনকে দেওয়া হয়। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা সুপারিশ আকারে উপস্থাপন করার দায়িত্বও কমিশনকে অর্পণ করা হয়েছিল।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বেসামরিক চাকুরিক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার সময় এ কমিটি লক্ষ্য করে যে, বিদ্যমান চাকুরি-কাঠামো অসংখ্য নামীয় পদের অস্তিত্বে আকীর্ণ। এসব পদ আবার ভিন্ন ভিন্ন পেশাগত সম্ভাবনার বেড়াজালে পরিবেষ্টিত ছিল। এগুলোতে বৃত্তিগত উন্নয়নের অভাব ছিল। শ্রেণি ও মর্যাদাভিত্তিই ছিল এগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিম্ন মর্যাদার পদে

প্রবেশ করে চাকুরীতে পদোন্নতি লাভ করে উচ্চতর পদে যাওয়ার কোনো সুযোগ প্রবেশকদের ছিল না। উপনিবেশবাদী ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকারকে পরিচালনার জন্য চাকুরী-কাঠামো এমনভাবে পরিকল্পিত ছিল যে তা স্বাধীন, সামাজিক, গণতান্ত্রিক ও ঐক্যের সরকার পরিচালনার জন্য বেমানান ছিল। শুধু তাই-ই নয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগের ঐ ধরনের সরকার-ব্যবস্থা দেশের দ্রুত উন্নয়ন ও সামাজিক পুনর্গঠনে অক্ষম ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা সঠিকভাবে প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে কমিশন দেশের বেসামরিক চাকুরী-কাঠামো এবং প্রশাসন-ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোয় প্রয়াসী হয়। কমিটি বাংলাদেশের বেসামরিক চাকুরীতে মাত্র একটি বৈষম্যহীন পদক্রমভিত্তিক চাকুরী-কাঠামো প্রবর্তনের সুপারিশ করে। সুপারিশে উল্লেখ করা হয় যে, একমাত্র সুস্পষ্ট প্রযুক্তিগত (Technical) কারণ ছাড়া কোনো শ্রেণীভুক্ত পদ সংরক্ষিত থাকবে না। বেসামরিক চাকুরীতে আসা এসব সদস্যকে তাদের বেছে নেওয়া চাকুরীক্ষেত্রে বৃত্তিগত বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে এবং যে কোনো স্তরের মেধাবী ব্যক্তিগণ যাতে দ্রুত উচ্চতর পদে উঠে যেতে পারে সে জন্য তাদের অবারিত সুযোগ থাকতে হবে। বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি বিষয়ক ও শিল্পীসুলভ মেধাবীগণ, শিক্ষক ও মাঠ কর্মকর্তাগণের মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিল কমিটি। জাতীয় সদর দফতরে (Headquarters-এ) কর্মরত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণকে পুরোভাগে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থার কথাও কমিটি তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। জাতির নতুন সামাজিক দর্শনের আলোকে নতুন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারিসহ বিদ্যমান কর্মচারীদের বুৎপত্তি অর্জন (Orientation) ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছিল। সুসমন্বিত ও বিজ্ঞানসম্মত পেশা ব্যবস্থাপনা এবং কর্মজীবী উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় কমিশনের সুপারিশে।

প্রশাসন-ব্যবস্থায় সচিবালয় হচ্ছে মূল স্নায়ু-কোষ এবং মূল চাবিকাঠি। এখানেই সরকারের প্রশাসনিক সব ধরনের নীতির উদ্ভব হয়, চূড়ান্তরূপ লাভ করে এবং সেগুলো কার্যকর করতে বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণের নিকট প্রেরিত হয়। এজন্য সচিবালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তাই, প্রশাসনিক ও চাকরী পুনর্বিন্যাস কমিটি সচিবালয়ের সংগঠন ও সচিবালয়সহ অন্যান্য দফতরসমূহের কার্যবিধি গতিশীল করে জনগণের সমস্যার আশু প্রতিকার ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ দ্রুততার সাথে বিবেচনা করে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়ে সুপারিশ করে। এ ছাড়া, স্বায়ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প-সংস্থাসমূহের প্রশাসন ও পদ্ধতিগত জটিলতার সহজীকরণ সম্পর্কেও সুপারিশ করেছিল এই কমিশন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার কমিশনের সুপারিশ গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকান্ডের পর পরবর্তী কোন সরকারই এ কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি।

জাতীয় বেতন কমিশন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৯৭২সালের ২১ জুলাই তারিখের এমএফ (প্রশাসন) ২ই-১(৩০০)/৭২/১০৮১ সংখ্যক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ. রবকে সভাপতি করে জাতীয় বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানের কবলমুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর পূর্ববর্তী কয়েক শ' কর্মচারীর জন্য প্রচলিত প্রায় দুই হাজার দুই শ' বৈষম্যমূলক ও অরাজক বেতন-হার (Pay Scales) নিয়ে কমিশনকে এক জটিলতম পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে বাংলাদেশ সরকার বেতন-হারে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। এই পরিবর্তনের ফলে পূর্বে প্রচলিত দুই সহস্রাধিক বেতন-হারকে মাত্র ১০টি গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্বের বেতন হারের যে বিশাল তারতম্য ছিল সেটিকে ভেঙ্গে ১০টি গ্রেডে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হারের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনা। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বঙ্গবন্ধুর সরকারই সুষ্ঠু সুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে পরিগণিত হওয়ার দাবিদার।

সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত সংবিধানে অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তি:

১৯৭২ সালের সংবিধানের নবম ভাগে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ, নিয়োগ, বদলি ও অবসান এবং কর্মবিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ১৩৩-১৩৬ ও ১৪০ এ বিবৃত করা হয়েছে। এছাড়াও, অনুচ্ছেদ ২০ এ কর্মের অধিকার, ২১(২) এ সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য, ২৯ এ সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতা- উল্লেখ করা হয়েছে।

সিভিল সার্ভিসে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সন্নিবেশন / Lateral entry:

একটি আধুনিক সরকারের কর্মচারীদের যে ধরনের পেশাগত দক্ষতা দরকার বঙ্গবন্ধু সেটি নিশ্চিত করেছিলেন। শুধুমাত্র প্রশাসনিক ক্যাডার বা আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর না করে তিনি দেশের প্রখ্যাত পেশাজীবী এবং চিন্তাবিদদের সরকারে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের মেধাকে দেশের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, বঙ্গবন্ধু সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ইতোপূর্বে তাঁর পরিচিত যে সকল কর্মকর্তা ও পেশাজীবী যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদেরকেও সরকারে নিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য, শিক্ষায় ড. এ আর মল্লিক এবং ড. আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন; প্রকৌশলীদের মধ্যে মঈনুল ইসলাম, শফিকুর রহমান, আল হুসেইনী প্রমুখ।

সামগ্রিক ও সুপরিকল্পিতভাবে দেশ পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যতের দ্রুত উন্নয়নের পথে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে জারিকৃত আদেশমূলে

পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে ডেপুটি চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয় প্রফেসর নূরুল ইসলামকে। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চেয়ারম্যান। প্রফেসর ইসলাম মন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিয়োগ পান। কমিশনের অন্যান্য সদস্য ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ: ডক্টর মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর রেহমান সোবহান ও ডক্টর আনিসুর রহমান। এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন।

উপসংহার:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রায় ৪৪ মাস। এ সময় নিয়োজিত ছিলেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে। রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক কাঠামোগুলোকে ঠিক করে গেছেন বঙ্গবন্ধু। সিভিল সার্ভিসকে উপনিবেশিক ধারা থেকে বের করে জনকল্যাণমুখী করেছেন। মাত্র এক বছরের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম সুলিখিত সংবিধান প্রণয়ন, রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ, জাতীয় প্রতীক প্রণয়ন, রাষ্ট্রের পরিচালনার কার্যপদ্ধতি এবং কার্যবণ্টন (রুলস অব বিজনেস এবং অ্যালোকেশন অব বিজনেস) তৈরি করা, যুদ্ধবিদ্ধস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ অর্জন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নসহ অসংখ্য মৌলিক কাজ তিনিই করে গেছেন তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা; তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণাবলী দ্বারা। বাংলাদেশকে যখন তিনি উন্নয়নের সোপান স্থাপন করে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার কষ্টকর পথ-পরিক্রমা পাড়ি দিতে শুরু করেছিলেন ঠিক তখনই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অশুভ চক্র পরাস্ত পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায় তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেছিল। হত্যাকান্ড ঘটিয়ে এই চক্র ক্ষান্ত থাকেনি। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতাও কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে এবং বাংলাদেশকে তারা পাকিস্তান ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল রাষ্ট্রে পরিণত করার নানাবিধ অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতির দৃঢ়তার কাছে পরাভূত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে এবং চিন্তা ভাবনাকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নিয়ে এসেছেন আজ এক নতুন উচ্চতায়। ২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তা অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয়। প্রায় এক বছর যাবৎ বিশ্বব্যাপী চলমান ভয়াবহ করোনা ভাইরাসের মহামারীও চমৎকার মোকাবেলা করে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা নিজে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে

পাওয়া স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর আদর্শের আলোকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

"জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।"

সূত্র: - লেখকের নিম্নোক্ত বইসমূহ:

১. বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১

২. বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-৭৫

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি

মো: শাহরিয়ার আলম [১৪]

পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ উদ্দেশ্য হল এমন একটি দিক নির্দেশনা যা অন্য দেশের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ এবং সম্পর্ককে বুঝায়। একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি নীতির বিকাশ সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বিবেচনা, অন্য দেশের নীতি বা আচরণ বা পরিকলাপনা দ্বারা প্রভাবিত হয় যা নির্দিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক নকশাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর বৈদেশিক নীতির প্রভাবক: বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার নীতির সমর্থক। সেই অহিংসা থেকেই তিনি আমাদের দেশকে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এবং নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু *Panchsheel Niti* অর্থাৎ 'Five Principles of Peaceful Coexistence' এর প্রবর্তক Chinese Premier Zhou Enlai এর সাথে ঘনিষ্ঠ হন এবং তাঁর নীতির দ্ধারা প্রভাবিত হন। এই *Panchsheel Niti* নীতির বৈশিষ্ট্য ছিল পারস্পরিক সম্মান, আগ্রাসনহীন, হস্তক্ষেপহীন , সাম্যতা এবং পারস্পরিক সুবিধা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। তদুপরি, ১৯৫৮ সালে, বঙ্গবন্ধু আমেরিকার Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University পরিদর্শন করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় সাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধুর বৈদেশিক নীতির ঘোষণা: ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি Associated Press এর সাথে বঙ্গবন্ধু এক সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে তিনি মাত্র ১৮ সেকেন্ডে একটি বৈদেশিক নীতি তুলে ধরেন যা সকলকে অবাক করে দেয়। সেখানে তিনি বাংলাদেশের Foreign Policy নিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন "Friendship to All and Malice to None"। আমাদের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট হচ্ছে Non-Alignment, Independent এবং Neutral. আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী।

১৯৭২ সালের ১৩ই মে American Broadcasting Corporation সাথে অন্য একটি সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু তাঁর বৈদেশিক নীতির ভিত্তি এবং নিরপেক্ষতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। সেখানে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, *"I'm not going to sell my freedom to anybody whoever might be"*।

১৪ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংবিধানে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি: স্বাধীন বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মৌলিক বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *"The State shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, noninterference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter."*।

বৈদেশিক নীতির প্রথম প্রকাশ এবং এর মুল লক্ষ্য: পাকিস্তানের কারাবাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে ১৯৭২ সালের ৮ই মার্চ বঙ্গবন্ধু লন্ডনে প্রথমবারের মতো তার বৈদেশিক নীতি প্রকাশ করেন এবং এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তার বৈদেশিক নীতির প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সদ্য জন্মগ্রহণকারী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং তারপরে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করা। তিনি সেখানে বলেন *"I now APPEAL to all states to extend recognition to the People's Republic of Bangladesh, to enter into diplomatic relations with us and to support our immediate admission to the United Nations."*। ঠিক এক সপ্তাহ পরেই ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু একই প্রতিধ্বনি করেন কিন্তু এখানে তিনি APPEAL এর পরিবর্তে Expect এবং ADMISSION এর পরিবর্তে Membership শব্দটি ব্যবহার করেন। বঙ্গবন্ধুর মত একজন কূটনীতিকের কাছে এটি একটি বিশাল পরিবর্তন যেখানে একটি অনুরোধ থেকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত দাবির একটি অনন্য দৃষ্টান্ত ছিল।

বাংলাদেশের পক্ষে স্বীকৃতি আদায়: স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু তাঁর বলিষ্ঠ কূটনীতির কারণে ভারত, সোভিয়েত-রাশিয়া, প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ যেমন ভুটান, মায়ানমার, নেপাল এবং কিছু পূর্ব ইউরোপীয় দেশের বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছেন। কিছু পশ্চিমা এবং মুসলিম দেশ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে বিলম্ব করলেও তাদের সমর্থন বঙ্গবন্ধু অর্জন করেছিলেন। ১৫ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে AP এর সাথে সাক্ষাৎকারে কূটনৈতিকভাবে বঙ্গবন্ধু শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যেমন যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি সম্পর্কে বলেন, "I don't like to blame anybody now. I hope ...they will recognize the REALITY and expect also.....they understood the REALITY. And I'm sure it would be very BIG PUBLIC PRESSURE on Nixon government."।

১৩ই মে ১৯৭২ সালে ABC-তে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু আবারো বাস্তবতার বিষয়টি উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেন যে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বাস্তবতাকে গ্রহণ করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। দেশের জনগণের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ও বিশ্বাস গণতন্ত্রের এবং জনগণের শক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাসকে সূচিত করে। তিনি মার্কিন সরকার সম্পর্কে কথা বলার সময়ও একই বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করেন।

১৯৭৪ সালের ১লা অক্টোবর বঙ্গবন্ধু এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছিল সেই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর বসার ভঙ্গিমা এবং অঙ্গভঙ্গি দেখার চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কুটনৈতিক আচরণ দিয়েই বোঝা যায় ক্ষমতার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই নিজেকে বিশ্ব মঞ্চে কী পরিমাণ উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গবন্ধুর শাসনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে চীন ও সৌদি আরব ছাড়া বাংলাদেশ ১০০টি বেশি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করে যদিও চীন ও সৌদি আরব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীকৃতি দেয়। তদুপরি, এই সময়ে, বাংলাদেশ বিশ্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ভারতের সাথে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চুক্তিও স্বাক্ষর করতে সমর্থ হয়।

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি: শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স কিংবা অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্র থেকে নয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক কারুকার্যের কারণেই স্বাধীনতার মাত্র তিন বছরের মধ্যে পাকিস্তান থেকেও স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জনাব ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান এবং পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান।

কমনওয়েলথে যোগদান প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর জবাব: বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ চেয়েছিলেন। কিন্তু Associated Press তাঁকে কমনওয়েলথে থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন "... আমি কমনওয়েলথের বিপক্ষে নই। আমি যদি স্বীকৃতি পাই তবে আমার সরকার এটিকে বিবেচনা করবে।" বঙ্গবন্ধুর এ জবাব ছিল নিঃসন্দেহে একটি উত্তম জবাব। এ জবাবের মাধ্যমে তিনি দূরদর্শীতার পরিচয় দেন।

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। জাতিসংঘের সনদে অন্তর্ভুক্ত সকল দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৭২ সালের ৮ই আগস্ট বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ চেয়ে UN

মহাসচিব জনাব Kurt Waldheim এর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। ১০ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু লন্ডনে একটি ক্লিনিকে থাকাকালীন জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে সমর্থনের অনুরোধ জানিয়ে চীনসহ সিকিউরিটি কাউন্সিলের সকল সদস্যকে চিঠি প্রেরণ করেন। ১১ই আগস্ট সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যরা বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদের আবেদনের বিষয়টি আরও বিবেচনার জন্য ২১শে আগস্ট পর্যন্ত সময় বর্ধিত করতে সম্মত হন। ২৩শে আগস্ট ব্রিটেন, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুগোস্লাভিয়া একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিলকে আহ্বান জানায় কিন্তু চীন ২৫শে আগস্ট ভেটো প্রদান করায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ঐ সময় জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে ব্যর্থ হয়।

২৬শে আগস্ট ১৯৭২ সালে Bangladesh Awami League of America জাতিসংঘে নিযুক্ত চীনা মিশনের সামনে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়ে চীনের ভেটো প্রদানের নিন্দা জানিয়ে একটি বিক্ষোভের আয়োজন করে। ৭ই জুন ১৯৭৪ সালে সিকিউরিটি কাউন্সিল জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়টি পূন:বিবেচনার জন্য তাদের এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করে। এরই মধ্যে উপমহাদেশের রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন আসে। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, জাতির পিতা লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলনে অংশ নেন এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে চীন তার পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

১০ ই জুন ১৯৭৪, সিকিউরিটি কাউন্সিলে বাংলাদেশের সদস্যপদের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। চীন ভোটদান থেকে বিরত থাকে। এরপরে সিকিউরিটি কাউন্সিলের সুপারিশ নিয়ে প্রস্তাবটি সাধারণ অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়। আমরা সকলেই জানি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধুর কুটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের কারনে সকল সম্পর্ক বজায় রেখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে সমর্থ হয়।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষণ: জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের মাত্র ৮ দিনের মাথায় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেন। জাতিসংঘে দাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে বলেন : "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সৎ-

প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষার সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।"

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক কূটনীতি: পররাষ্ট্রনীতির মুল কাঠামো এবং অন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর পরই বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রতি নজর দেন। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠনের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে তাদের মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান। লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু সাহায্যের জন্য যুক্তরাজ্যসহ সকলের কাছে আহবান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহবানের মাঝেও ছিল এক ধরনের দেশপ্রেম। তাঁর উদ্ধৃতি থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশম্যাটিক কূটনীতির ধারণা পেতে পারি। বঙ্গবন্ধু বলেন, "যে কোনও দেশ থেকে সহায়তা গ্রহণ করা হবে ... তবে এই ধরনের সহায়তা হতে হবে অবশ্যই নিঃশর্ত, রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব এবং সাম্যের নীতির ভিত্তিতে এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে।" বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রসঙ্গে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু কেবল সহায়তা এবং উন্নয়ন সহায়তার উপর নির্ভর করেননি। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য এবং তাঁর 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে তিনি পাট, চা, চামড়া, মাছ ও বনজ পণ্য রফতানি প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ABC এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

বিশ্বের মুসলিম ও নিপীড়িত দেশ এবং জনগনকে সমর্থন: বঙ্গবন্ধু সবসময় বিশ্বের মুসলিম ও নিপীড়িত দেশ এবং জনগণকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু চতুর্থ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) সম্মেলনে অংশ নিয়ে সেখানে বক্তব্যে বলেন, "পৃথিবী নিপীড়িত ও অত্যাচারী এ দুটি ভাগে বিভক্ত এবং আমি নিপীড়িতদের সাথে আছি"। তিনি সর্বদা ফিলিস্তিনিদের সকল ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করেন। ১৯৭৪ সালে OIC সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু মুসলিম ভাইদের সংহতির আহবান জানান। ৬ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে কায়রোতে একটি ভোজসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমাদের সাথে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ সকল আরব দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর বাংলাদেশের সরকার ও জনসাধারণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতিটি আরব স্বার্থকে আমরা নিজেদের স্বার্থ বলে মনে করে থাকি।"

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু: বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদানে অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু হলেন আমাদের 'রাজনীতির কবি'। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। তিনি শান্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি আশা করতেন যে উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়কে শান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেন। বঙ্গবন্ধু বলেন "আমাদের

আজকের এই ক্ষমতাকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আগের চেয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করা দরকার, এ শক্তি ধ্বংস করার জন্য নয়, সৃষ্টি করার জন্য; যুদ্ধ করার জন্য নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য; মানুষের দুর্ভোগকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য নয়, মানব কল্যাণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৩ সালের ২৩ শে মে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব শান্তি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে Joliot-Curie পদক প্রদান করা হয়। এ পুরষ্কার তাঁকে বঙ্গবন্ধু থেকে 'বিশ্ববন্ধু (রমেশ চন্দ্র, এসজি, ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল) পদে উন্নীত করেছিল। এটি ছিল বাংলাদেশের হয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা। ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বক্তব্যে বিশ্বের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, "সম্প্রতি বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে সেই পটভূমির বিরুদ্ধে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।"

আমরা যদি তাঁর বৈদেশিক নীতি ও রাষ্ট্রতন্ত্রের কারুকাজ নিয়ে কথা বলতে থাকি তবে কয়েক ঘন্টায়ও শেষ হবে না। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে Loren Jenkins মন্তব্য করেছিলেন *"Tall for a Bengali, with a stock of greying hair, a bushy moustache and alert black eyes, Mujib can attract a crowd of a million people to his rallies and hold them spellbound with great rolling waves of emotional rhetoric. 'Even when you are talking alone with him', ... 'he talks like he's addressing 60,000 people.' (Loren Jenkins, 'Poet of politics'* Newsweek, 5.4.1971)

১৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বিবিসি'র সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট সাথে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন আমার সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা হচ্ছে আমি আমার মানুষকে ভালবাসি আর আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমি তাদের বড্ড বেশি ভালবাসি।

অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু এত খ্যাতি, এত ভালবাসা অর্জন করেছিলেন যা অন্য কোন নেতা পাননি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা সেই নেতাকে হত্যা করেছি। আমরা এতটাই নির্দয়, এতটাই অকৃজ্ঞ? আমরা বাংলায় জন্মগ্রহণকারী একজন লেনিন, একজন গান্ধী, একজন নক্রুমাহ, একজন লুমুমবা বা একজন ফিদেল ক্যাস্ত্রোকে হত্যা করেছি। তাঁর মর্মান্তিক

হত্যার বিষয়ে ফিদেল ফিদেল কাস্ট্রো বলেছিলেন "বিশ্বের নিপীড়িত জনগণ শেখ মুজিবের মৃত্যুতে তাদের এক মহান নেতাকে হারিয়েছে এবং আমি একজন সত্যিকারের বড় মনের বন্ধুকে হারিয়েছি"

বর্তমানে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই আমরা দেশের জন্য একটি টেকসই ও সমতাপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতিতে এগিয়ে চলছি। প্রাক্তন ব্রিটিশ সাংসদ Michael Burns বলেছিলেন *"With the dangerous and difficult years ahead, Bangladesh is going to need Mujib's brand of leadership more than ever."*

ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু

মোঃ মোজাম্মেল হক খান [১৫]

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৫৫ বছর ৪ মাস ২৭ দিনের সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে ৪,৬৮২ দিন (প্রায় ১৩ বছর) কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন । ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে আমৃত্যু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির এমন বিষয় নাই যেটি তিনি তাঁর বক্তৃতায় আলোকপাত করেননি যার মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল প্রণিধানযোগ্য।

আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু । আমি প্রথমেই দুর্নীতি সম্পর্কে কিছু সংজ্ঞা ও পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করবো। পরবর্তীতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের যে কঠোর অবস্থান তা ক্ষুদ্র প্রয়াসে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

সংজ্ঞা: **1.** According to World Bank, Corruption is **"the misuse of public office for private gain".**

2. Transparency International (TI) defines as **"**Corruption is the abuse of entrusted power for private gain".

3. Anti Corruption Commision of Bangladesh defines Corruption' as the offences set out in the schedule to this law. Schedeled offences are sections 161-169, 217,218, 409, 420, 467, 468, 471 and 477A of the Penal Code, 1860 means bribery, forgery etc. by public officials.

4. "Corruption derermines democracy and rule of law. It leads to violations of human rights. It erodes public trust in government. It can even kill –for example, when corrupt officials allow medicines to be tampered with or when they accept bribes that enable terrorist acts to take place".-Ban Ki Moon, Former UN Secretary General on 17 September, 2017.

5. "Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a government's ability

১৫ কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন ও সাবেক সিনিয়র সচিব

to provide basic services feeding inequality and injustice and discouraging foreign investment and aid.''-Kofi Anan, Former UN Secretary General on 31 October, 2003.

দুর্নীতিকে দমন ও প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রবর্তিত হয়। যার মাধ্যমে দুর্নীতিকে সমাজ থেকে দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যেমন- দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭, পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ এবং সর্বশেষ দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৬)।

১৯৭৫ সালের ২৫ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সে ঘোষণায় তিনি দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলেন, "যে কাজে ফাঁকি দেয়, যে ঘুষ খায়, যে স্মাগলিং করে, যে ব্লাক মার্কেটিং করে, যে হোর্ড করে, যারা কর্তব্য পালন করে না, যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারা দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে"। (বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, আনু মাহমুদ)

তরুণ বয়সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর স্পষ্ট অবস্থান:

১৯৭৩ সালে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, বিশ্ব আজ দুটি ভাগে বিভক্ত। শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। এই শোষিতের পক্ষে থাকা মানেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি লক্ষ্য করেন। ১৯৪৩ সালে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন তিনি খাদ্য গুদামজাতকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অবিভক্ত বাংলার সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অনুরোধ জানান।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিগ লীগের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারে মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর হাতে ছিল শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তর। বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতা সেই তরুণ বয়সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর স্পষ্ট অবস্থান ঘোষণা করেছিলেন। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পিরোজপুর শহরের গোপালকৃষ্ণ টাউন ক্লাব মাঠে পিরোজপুর মহকুমা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় তিনি বলেন, '...কোনো অফিস-আদালতে দুর্নীতি হলে এবং আপনাদের নিকট কেউ ঘুষ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তিন পয়সার একটি পোস্ট-কার্ডে লিখে আমাকে জানাবেন। আমি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব, যাতে দুর্নীতি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।'

৩রা এপ্রিল ১৯৫৭ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে দুর্নীতি দমন বিল উত্থাপিত হয়। যথাযথ আইনের অভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলে উত্থাপিত বিলের পক্ষে জোরালো ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করে যে "প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন লোকের টাকা সদুপায়ে কি অসদুপায়ে অর্জিত হয়েছ তাহা জানিবার কোন ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয় নাই। সেজন্য সরকার অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না যদিও বা তাহারা জানেন যে অনেক ছোট ছোট অফিসার বৃহৎ বৃহৎ ইমারত তৈয়ারি করিতেছে। এই বিল পাশ হওয়ার পর এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে"। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মঞ্জুরী ছাড়া কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায় না বলিয়া তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকার ১৯৫৮ সালে দুর্নীতির মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে বঙ্গবন্ধু সে মামলা থেকে অব্যাহতি পান।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেন:

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির একটা শক্তভিত করার জন্য এবং দেশের মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দেয়ার জন্য দেশ থেকে চিরতরে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য লড়াই করে গেছেন। বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি দুর্নীতিবাজদের উৎখাতের কথা বলেন। যেমন:

"১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনগণের উদ্দেশে বলেন যার যা কাজ ঠিত মত করে যান। কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুষ খাবেন না। এ দেশে আর কোন দুর্নীতি চলতে দেয়া হবে না"।

জনগণের পাশাপাশি তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণেও বঙ্গবন্ধু দুর্নীতির দুর্বিষহ অবস্থা তুলে ধরেন। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তাতে জয়ী হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ১৯৭৫ সালের ১১ই জানুয়ারি কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি ব্যাচ পাসিং আউট প্যারেডে প্রধান অতিথির বক্তৃতা বঙ্গবন্ধু বলেন, '...এত রক্ত দেওয়ার পরে যে স্বাধীনতা এনেছি, চরিত্রের পরিবর্তন অনেকের হয় নাই। এখনো ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরকারবারি, মুনাফাখোরী বাংলার দুঃখী মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে দিয়েছে। দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত আমি এদের অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি, হুমকি দিয়েছি, চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনি। কিন্তু আর না।' ১৫ই জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় এবং একই বছরের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দুর্নীতিবাজদের উৎখাতের আহবান জানান।

২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেমন খাদ্য মজুদ, রাস্তা তৈরি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। সে ভাষণে তিনি প্রধানত শিক্ষিত ব্যাক্তিদের দুর্নীতির জন্য দায়ী করেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু বলেন "আমরা যে ৫% শিক্ষিত সমাজ, আর আমরাই বক্তৃতা করি, আমরাই লিখি খবরের কাগজে। আমরাই বড়াই করি। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এসব চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে। কবরে যেতে হবে। কিছুই সে কবরে নিয়ে যাবে না। তবু মানুষ ভুলে যায়। কি করে এ অন্যায় কাজ করতে পারে? ... আর এ দু:খী মানুষ যে রক্ত দিয়েছে, স্বাধীনতা এনেছে, তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনিয়ে সেই খাবার চুরি করে খাবে; অর্থ আনব, চুরি করে খাবে; টাকা আনব, চুরি করে খাবে; টাকা আনব, তা বিদেশে চালান দেবে। বাংলার মাটি থেকে এদের উৎখাত করতে হবে"।

একই তারিখে (২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫) সংসদের অপর অধিবেশনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু মাননীয় স্পিকারকে উদ্দেশ করে উপরোক্ত বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করে আহ্বান জানিয়েছিলেন, "দেশকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান, মানুষের দুঃখ দূর করুন। আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারিদের উৎখাত করুন"।

বঙ্গবন্ধু ঐ ভাষণে বাংলাদেশকে যারা ভালোবাসে না, তাদের উদ্দেশে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "যার যা ইচ্ছা লেখে, কেউ এ নামে বাংলাদেশকে ডাকে, কেউ ও নামে বাংলাদেশকে ডাকে। বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার। যেমন নাই চোরাকারবারি, ঘুষখোর, মুনাফাখোরদের, যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের।"

৮ই মার্চ, ১৯৭৫ টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ দুঃখ দূর হয়ে যাবে যদি দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায়।"

আইন করে দুর্নীতি দমন করা যায় না:

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭২ যশোরে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আইন দিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করা যায় না"। জনমত গঠন, প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নৈতিকতা এবং মাইন্ডসেট পরিবর্তনের উপর তিনি জোর দেন। নীতিহীন, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে। তাই তিনি দুষ্ট প্রকৃতির সদস্যদের প্রতিষ্ঠানে না রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪ তারিখে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তৃতা সেওয়ার সময় তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রয়াসের

উদাত্ত আহ্বান জানান। "আপনারা যাঁরা বুদ্ধিজীবী, যাঁরা দেশকে নেতৃত্ব দেন, তাঁদের কর্তব্য হবে আত্মসমালোচনা করা। আর আওয়ামী লীগের সহকর্মী ভাইয়েরা, তোমরা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের পিছনে লাগো। হোর্ডারদের পিছনে লাগো। ঘুষখোরদের পিছনে লাগো। তোমরা আমার কথায় আগেও লেগেছো, এখনো লাগো। শুধু আইন দিয়ে, শুধু শক্তি দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায় না। এজন্য এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যেমনভাবে ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে আমরা আন্দোলন করেছিলাম। যেমনভাবে ২৫শে মার্চ থেকে ন'মাস পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম। তেমনি বাংলার মাটিতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে- দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর ও শোষকদের বিরুদ্ধে। আমি বিশ্বাস করি, তাহলে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি উঠে যাবে"।

২৬শে মার্চ ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামীলীগ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় জাতির জনক দেশ থেকে দুর্নীতিবাজদের উৎখাতের আহবান জানান। ঐ জনসভায় তিনি বলেন জনগণের সমর্থন ছাড়া আইন করে দুর্নীতি দমন করা যায় না। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি বলেন "এত চোর কোথা থেকে পয়দা হয়েছে জানিনা । পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোর রেখে গেছে। এই চোর নিয়ে গেলে বাঁচতাম। কিন্তু দালাল গেছে, চোর গেলে বেঁচে যেতাম"।

২১শে জুলাই ১৯৭৫ নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "কিন্তু শুধু নিজেরা ঘুষ খাওয়াই করাপশন নয়। এ সম্বন্ধে আমার কথা হলো, করাপ্ট পিপলকে সাহায্য করাও করাপশন। নেপোটিজমও কিন্তু এ টাইপ অব করাপশন। স্বজনপ্রীতিও কিন্তু করাপশন। আপনারা এসব বন্ধ করুন। ... স্বজনপ্রীতি ছেড়ে দিলে আপনারা করাপশন বন্ধ করতে পারবেন।... আর আজ আমার কাছে আপনারা তওবা করে যান যে স্বজনপ্রীতি করবেন না। ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না।"

বঙ্গবন্ধু তাঁর বিভিন্ন রচনাবলীতে দুর্নীতি নিয়ে উদ্বৃতি দেন:

অসমাপ্ত আত্মজীবনী:

জাতির পিতা সেই ছোট বেলা থেকেই সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ছাত্র জীবনে দেখেছেন কীভাবে মানুষ দুর্নীতি করে। দেখেছেন কীভাবে এমএলএ-রা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৩) তিনি উল্লেখ করেন "এর পূর্বে আমার ধারণা ছিলনা না যে, এমএলএ-রা এইভাবে টাকা নিতে পারে। এরাই

দেশের ও জনগণের প্রতিনিধি! আমার মনে আছে, আমাদের উপর ভার পড়ল কয়েকজন এমএলএ-কে পাহারা দেয়ার, যাতে তারা দল ত্যাগ করে অন্য দলে না যেতে পারে"।

একই গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু বলেন, "একবার একজন এমএলএ-কে মুসলীম লীগ অফিসে আটকানো হল। তিনি বারবার চেষ্টা করেন বাইরে যেতে, কিন্তু আমাদের জন্য পারছেন না। কিছু সময় পরে বললেন, আমাকে যেতে দিন, কোন ভয় নাই। বিরোধী দল টাকা দিতেছে, যদি কিছু টাকা নিয়ে আসতে পারি আপনাদের ক্ষতি কি? ভোট আমি মুসলীম লীগের পক্ষেই দিব।" বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। বৃদ্ধলোক, সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া কিছু জানেন, কেমন করে এই কথা বলতে পারেন আমাদের কাছে? টাকা নেবেন একদল থেকে আবার ভোট দেবেন অন্য দলে। কতটা অধঃপতন হতে পারে আমাদের সমাজে!"

এ প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টল চার্চিলের একটি গল্প (রুপক অর্থে) প্রাসঙ্গিক। চার্চিল ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে witty এবং humorous বক্তা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একবার চার্চিল ট্যাক্সি নিয়ে বিবিসি অফিসে গেলেন বক্তব্য রাখার জন্য। চার্চিল ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বললেন "তুমি কি আমার জন্য ৪০ মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে"? ড্রাইভার জবাব দিলেন "না আমি এখনই বাসায় ফিরে যাব এবং টেলিভিশনে চার্চিলের বক্তব্য শুনবো"। একথা শুনে চার্চিল ড্রাইভারকে ১০ পাউন্ড বকশিশ দিলেন। ড্রাইভার ভোট পাল্টে বললো "স্যার, চার্চিল নরকে যাক আপনি না ফেরা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো"। এ হলো দুর্নীতির উদাহরণ।

কারাগারের রোজনামচা:

বঙ্গবন্ধু তার দীর্ঘ কারাজীবনে কারা অভ্যন্তরের বিভিন্ন দুর্নীতি প্রত্যক্ষ করেছেন। 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৭) বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "দুঃখের বিষয়, কয়েদিদের কপালে ভালো ঔষধ কম জোটে। কারণ ভালো ব্যবহারের ডাক্তার যারা, যারা কয়েদিদেরও মানুষ ভাবে, আর রোগী ভেবে চিকিৎসা করে, তারা বেশি দিন জেলখানায় থাকতে পারে না। অনেক ডাক্তার দেখেছি এই জেলখানায়, যারা কয়েদিদের ডাইট দিতে কৃপণতা করে না, অসুস্থ হলে ভালো ঔষধ দেয়। আবার অনেক ডাক্তার দেখেছি, যারা কয়েদিদের কয়েদিই ভাবে, মানুষ ভাবে না, রোগ হলে ঔষধ দিতে চায় না। পকেটে করে ঔষধ বাইরে নিয়ে বিক্রি করে। ঘুষ খায় চিকিৎসার নামে। আবার টাকা পেলে হাজতিদের মাসের পর মাস হাসপাতালে ভর্তি করে রাখে, ব্যারাম নাই যদিও। এভাবে বাইরের থেকে জামিনের চেষ্টা করা যায়। ম্যাজিস্ট্রেট যখন জেলখানায় দেখতে যায় কয়েদিদের অবস্থা, তখন হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি দেখায় দেয়। এতে জামিন পেয়ে যায়। বাইরে থেকে বিচারাধীন আসামির কেউ হয়তো কোনো ডাক্তারের সাথে

দেখা করে টাকা পয়সা দিয়ে গেছে, বলে গেছে জামিন হলে আরো দেবে। যার অসুখ নাই তাকে মাসের পর মাস হাসপাতালে সিট দিয়ে রেখে দিয়েছে, আর যে সত্যিই রোগী তার স্থান নাই। ... আবার এমন ডাক্তার দেখেছি, যারা জেলখানায় পানিও মুখে দেয় না। ঘুষ তো দূরের কথা, রোগীদের ভালোভাবে চিকিৎসা করে, রাতদিন পরিশ্রম করে। আবার এমন ডাক্তার জেলে দেখেছি, সুন্দর চেহারা। মুখে দাড়ি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালে দাগ পড়ে গেছে, দেখলে মনে হয় একজন ফেরেস্তা। হাসপাতালের দরজা বন্ধ করে কয়েদি রোগীদের ডাইট থেকে ডিম, গোস্ত, রুটি খুব পেট ভরে খান, আর ঔষধও মাঝে মাঝে বাইরে নিয়ে বিক্রি করেন।"

আমার দেখা নয়াচীন:

বঙ্গবন্ধু তাঁর আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থে (পৃ. ১০৪-১০৫) উল্লেখ করেন " সকলের চেয়ে দুঃখের কথা হলো, অনেক দুর্নীতিপরায়ণ নেতা দেশে আছে যারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলাইয়া চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। যখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো সৎ কর্মচারী মামলা দায়ের করতে চায় তখনই বড় বড় মন্ত্রীরা এই সমস্ত কর্মচারীদের বদলি করে মামলা ধামাচাপা দেয়।...দুঃখের বিষয় কয়েকজন মুসলমান নামধারী নেতা পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করে দুর্নীতি, ঘুষ ও চোরাকারবারিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। নিজেরাও অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। দেশের রাষ্ট্রনায়করা যদি দুর্নীতিপারয়ণ হয় তবে আর দেশের কর্মচারী ও জনগণ দুর্নীতিপরায়ণ কেন হবে না? দুর্নীতি সমাজের ক্যানসার রোগের মতো। একবার সমাজে এই রোগ ঢুকলে সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর।"

সৎ নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হলে মানুষ যে পরিবর্তিত হয়, দেশকে ভালোবাসতে শেখে তার ছবি তিনি তুলে ধরেছেন স্মৃতিকালীন রোজনামচায়-

একজন টিকিট চেকার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দোভাষীর মাধ্যমে-আপনি টিকিট ছাড়া লোক কতদিন দেখেন নাই? সে বললো, প্রায় দেড় বৎসর। তবে যদি গাড়ি ছাড়বার সময় তাড়াতাড়ি উঠতে হয়, তবে পরের স্টেশনে আমাকে খবর দেয় আমি টিকিট দিয়ে আসি। আজকাল আর আমাদের টিকিট চেক করতে হয় না, কারণ কেহই বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠে না। আর ফাঁকি দিতেও চেষ্টা করে না। তারা মনে করে এ পয়সা তাদের নিজেদের, রাষ্ট্র তাদের, গাড়ি তাদের, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে লাভ কী? তবুও সে বললো অন্যান্য লাইনে ২/১টা ঘটনা এখনও আছে, তবে ধরা পড়লে যাত্রীর দলই তাকে এমন শায়েস্তা করে, জীবনেও ভুলবে না। আর সরকারও ভীষণ শাস্তি দেয়।...

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি মনে করেন, চোরের দল পালাইয়া গেছে আর যারা সাধু

বলে পরিচিত তারা আছে?" তিনি উত্তর করলেন, "এ কথা আপনি বলতে পারেন। তবে যারা সত্যবাদী, ঘুষ খায় না, দেশকে ভালোবাসে ও কর্মঠ তারা আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বেতন কত পান?" উত্তর দিলেন, "বেশ পাই, চলে যায়। চিয়াং কাইশেক আমলের চেয়ে বেশি পাই। থাকবার জায়গা পাই। অনেক সুবিধা আছে। তবে তাড়াতাড়ি তো কিছু হয় না, সময় দরকার।"

ভালোর বিপরীত যেমন মন্দ, সুনীতির বিপরীতে তেমনি দুর্নীতি। দেশে ও বিদেশে দুর্নীতিবাচক বহুল পরিচিত একটি শব্দ হলো 'ঘুষ'। এই শব্দের সঙ্গে জড়িত কর্মকার্তকে দারুণভাবে ঘৃণা করতেন আমাদের বঙ্গবন্ধু। নতুন শাসন ব্যবস্থায় নয়াচীনে ঘুষের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থায় স্বস্তি পেয়েছিলেন। তিনি বলেন-

এক জায়গায় এক ঘটনা শুনলাম, এক সরকারি কর্মচারী ঘুষ খেয়েছিল, তাকে জনসাধারণ ধরাইয়া দেয়। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। সেই হতে কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। কেউই ঘুষ খেতে সাহস পায় না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, ১৪ বৎসরে রাজনীতিতে আমার শিখবার ও দেখবার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। পূর্বে শুনতাম, দারোগা পুলিশের মতো ঘুষ কেউ খায় না। তারপর শুনতাম, সিভিল সাপ্লাইয়ের মতো ঘুষ কেউ খায় না, তারপর শুনতাম কাস্টমস অফিসারদের মতো ঘুষ কেউ খায় না। আমি কয়েক বৎসর রাজবন্দি হিসেবে জেল খেটেছি, তাতে দেখেছি জেলখানার ঘুষের মতো বৈজ্ঞানিকভাবে ঘুষ বোধ হয় কোনো ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা নিতে জানে না। কোনো দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মচারীর উপায় নাই যে সে ঘুষ ধরে! জেলখানা, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, কাস্টম্স, কোর্ট-কাচারি, সাব রেজিস্ট্রার অফিস, ইনকাম ট্যাক্স, কারো চেয়ে কেউ কম না, এই ধারণাই আমার শেষ পর্যন্ত হয়েছে। জাতির নৈতিক পরিবর্তন ছাড়া ও সুষ্ঠু কর্মপন্থা ছাড়া দেশ থেকে দুর্নীতি ও ঘুষ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। এই দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করা দরকার।

নয়াচীনে গৃহীত দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থাদি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি প্রশংসা করেছেন নতুন রাষ্ট্রের নতুন কর্ণধারদের-

"নয়াচীন থেকে দুর্নীতি তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, রাষ্ট্রের কর্ণধাররা ঘুষ দুর্নীতি তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। আমি নয়াচীনে একটা ঘটনা শুনেছিলাম যে, মাও সে তুংয়ের একজন প্রধান বন্ধু এবং নয়াচীনের নেতা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বলে তাকে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ইচ্ছা করলে মাও সে তুং তাকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু বিচারে যাকে ফাঁসির

হুকুম দিয়েছে তাকে রক্ষা করা অন্যায়"।

জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন-

"দেশের রাষ্ট্রনায়করা যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে আর দেশের কর্মচারী ও জনগণ দুর্নীতিপরায়ণ কেন হবে না? দুর্নীতি সমাজের ক্যানসার রোগের মতো। একবার সমাজে এই রোগ ঢুকলে সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর। আমাদের দেশের বিচারে একটা লোক আর একজনকে হত্যা করলে বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ডাকাতি করলে বা চুরি করলে তাকে কয়েক বৎসর ধরে সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। একটা লোক হঠাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে আর একটা লোককে হত্যা করলো, যাকে হত্যা করা হয় তার সংসারটা খতম হয়ে যায়। কারণ, সেই লোকটার ওপর সমস্ত সংসার নির্ভর করে। কিন্তু চোরাকারবারিকে ফাঁসি দেওয়া হয় না, ফাঁসি যদি কাহাকেও দিতে হয়, তবে চোরাকারবারি ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদেরই দেওয়া উচিত"।

একই গ্রন্থে (পৃ. ১০৭) বঙ্গবন্ধু বলেন, "নয়াচীন থেকে এসে আমার এই মনে হয়েছে যে, জাতির আমূল পরিবর্তন না হলে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা কষ্টকর। নতুন করে সকল কিছু ঢেলে সাজাতে হবে। ভাঙা দালানে চুনকাম করে কোনো লাভ হয় না – বেশি দিন টিকে না। আবার ভেঙে পড়ে। পুরান দালান ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুললে, ঘুণ ধরতে বা ভেঙে পড়তে অনেক সময় লাগে। সাথে সাথে ভিত্তিটা মজবুত করতে হয়। ভিত্তি মজবুত না হলে সামান্য বাতাসে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে"।

চীন ভ্রমণের প্রায় চার বছর পরের ঘটনা। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে যোগদান করেছেন তিনি। দায়িত্ব গ্রহণের সূচনাতেই দুর্নীতি সম্পর্কে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করলেন-ইহাও দেশের অগ্রগতি এতদিন ব্যাহত করিয়াছে। প্রত্যেকটি দুর্নীতিপরায়ণ লোককে অবিলম্বে জেলে বদ্ধ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে বেত্রাঘাত করিতে হইবে।

২৮শে অক্টোবর ১৯৭০ পাকিস্তান টেলিভিশন ও রেডিও পাকিস্তান আয়োজিত 'রাজনৈতিক সম্প্রচার' শীর্ষক বক্তৃতামালায় বঙ্গবন্ধু বলেন- আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একট সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। ...আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিস্তার করে আছে তাকে অবশ্যই নির্মূল করতে আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

দীর্ঘ দশমাস পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন। ঐদিন বিকেলে লক্ষ লক্ষ অধীর আগ্রহী শ্রোতা বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানালো ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বললেন- একটা কথা, আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি-ডাকাতি না হয়। বাংলায় যেন আর লুটতরাজ না হয়। ...আমি চাই জমিতে যারা ধান বুনাও। সব কর্মচারীদের বলে দিবার চাই একজনও ঘুস খাবেন না। মনে রাখবেন তখন সুযোগ ছিল না। আমি দোষ ক্ষমা করবো না। ৯ই মে ১৯৭২ তারিখে তিনি কঠোর ভাষায় রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় চোর ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন- দুঃখ হয় কি জানেন? আমি ভিক্ষা করে চাল নিয়ে আসি, আমি গ্রামে গ্রামে পাঠাই, আর চোরাকারবারী সে মাল চুরি করে খায়। ইচ্ছে হয়, ওদের পেটের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে আমি কালোবাজারীর পয়সা বের করে আনি।

৩রা জুলাই ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু কুষ্টিয়ায় একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। উক্ত ঐ সভায় দুর্নীতিবাজ নেতাকর্মীদের আওয়ামী লীগ থেকে বের করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন- আমি সমস্ত অফিসার, কর্মচারীদের হুকুম দিলাম, জনগণের কাছে আবেদন করতেছি। দরকার যদি হয়, যারা চোরাকারবারি, যারা স্মাগলিং করে, কার্ফু দিয়া তোমরা সেখানে সার্চ কর এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর, কঠোরভাবে এদের দমন কোরো। কোনও দয়া নাই, কোনও মায়া নাই, কোনও মমতা নাই।...

আমি বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো। আপনাদের সাথে আমার দাবি রইল, যদি কোনদিন আমি দেখি, যে বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে না, সেদিন মনে রাখবেন এই প্রধানমন্ত্রিত্ব আমি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আমার বাড়িতে ফিরে যাবো। আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি। আমি চাই বাংলার মানুষ সুখে পেট ভরে ভাত খাক। আমি চাই অত্যাচার অবিচার বন্ধ হোক। আমি চাই দুর্নীতি ঘুষখোর ধ্বংস হোক।

৪ঠা জুলাই ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে কুমিল্লা সফর করেন। ঐ জনসভায় তিনি ত্রাণ আত্মসাৎকারী ও ঘুষখোরদের উদ্দেশ্যে বলেন- যদি কেউ রিলিফের জিনিস চুরি করে, তারে কানটি ধরে থানায় দিয়ে দিয়ো। ওর চিরজীবন জেলের মধ্যে থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন "দোষীকে মাফ কোরো না। আর মেহেরবানি করে তোমাদের কাছে আবেদন করছি। অনুরোধ করছি। ঘুষ খেয়ো না"।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল কর্মচারী জনগণের সেবক। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদে দেওয়া ভাষণে সে কথাটি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন "সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব

পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন, সেবক। ...গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য"।

কেবল মানুষকে ভালোবাসা এবং সততাই যে ব্যক্তির প্রকৃত যোগ্যতা তা তিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন। সেজন্যই বিবিসির সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট যখন বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনার কোয়ালিফিকেশন কী? তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "...আই লাভ মাই পিপল। What is your disqualification? I love them too much. বোধ হয় সেটা অনেকে দুর্বলতা মনে করে নিয়েছিল এবং সেই দুর্বলতার খাতিরে যার যা ইচ্ছা ফ্রি স্টাইল চালিয়েছে। শৃঙ্খলা ফিরে না এলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। সততা ফিরে না এলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। নিজেদের কর্তব্য কী সে সম্পর্কে তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন "শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবেন, মানুষকে ভালোবাসবেন। একদিকে যেমন কঠিন পাথর হবেন, তেমনি আবার প্রাণে যাতে মায়া মমতা থাকে তার দিকে খেয়াল রাখবেন"।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭২ ঢাকায় মুজিবনগর কর্মচারী সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ঘৃণার সঙ্গে বলেন "দুর্নীতিতে দেশ ভরে গেছে। কেন যেন একটা মানুষের পয়সা করার নেশা হয়ে গেছে। যাকে যে কাজ দেই সেখানে যেন দুই পার্সেন্ট কমিশন খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে"।

দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তিনি আরও বলেন "আমার দেশের কিছু কিছু কর্মচারী আজ ঘুষ খায়, দুর্নীতি করে, ডাকাতি করে। লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। আমি বলে এই জাতির পিতা! আমি গর্ব অনুভব করি যে ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে, তার পিতা আমি। আমি গর্ব অনুভব করি যে জাতি রক্ত দিয়েছে সে জাতির পিতা আমি। কিন্তু ঘুষখোর দুর্নীতিবাজের পিতা আমি নই"। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানেও বঙ্গবন্ধু তাঁর দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের সন্নিবেশ ঘটান। এক্ষেত্রে সংবিধানের নিম্নোক্ত ২টি অনুচ্ছেদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

২০(২)- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, যেখানে সাধারন নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না।"

২১(২)- "সকল সময়ে জনগনের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"।

১৯৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর ১৮ই মার্চ ১৯৭৩

তারিখে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক বিশাল জনসভায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন "পে-কমিশনার বসায়ে দিয়েছি। মিথ্যা ধোঁকা দেওয়ার মানুষ আমি নই। এই এক মাস, দুই মাসের মধ্যেই পে-কমিশন আর বিসিএসই কমিশনের রিপোর্ট বের হয়ে যাবে। তাকে আপনারা বাঁচার মত পয়সা পেতে পারেন। মেহেরবানি করে ঘুষ-দুর্নীতি থেকে দূরে থাকেন"।

২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তিনি বলেন "আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারী, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মবিক্রি করতে হবে, এদের অধিকারের নামে আমাদের এদেরকে ফ্রি-স্টাইল ছেড়ে দিতে হবে? কক্ষনো না। কোনো দেশ কোনো যুগে তা দেয় নাই। দিতে পারে না। যারা আজকে আমার মাল বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারী করে, যারা দুর্নীতি করে, এদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে"।

সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে পর্যায়ক্রমে তিনি বলেন "আজকে corruption-এর কথা বলা হয়। আজকে বাংলার মাটি থেকে corruption উৎখাত করতে হবে। corruption বাংলার কৃষক করে না। corruption বাংলার মজদুর করে না। corruption করি আমরা শিক্ষিত সমাজ-যারা আজকে এদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি। আজ যেখানে যাবেন corruption দেখবেন। দেখবেন- যেখানে আমরা রাস্তা করছি, সেখানে corruption। খাদ্য কিনতে যাই, corruption। জিনিস কিনতে যাই, corruption। বিদেশের টাকা ওঠাতে corruption। কারা করে? আমরা যারা five percent, যারা শিক্ষিত-আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে corrput people। আর, আমরা করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে। আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এভাবে চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে, কবরে যেতে হবে- কী সে নিয়ে যাবে? তবু মানুষ ভুলে যায়। কেমন করে এই কাজ চলতে পারে!"

বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম:

- ১৯৪৩ সালে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন বঙ্গবন্ধু খাদ্য গুদামজাতকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বাংলার সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীকে অনুরোধ জানান। ঐ সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের গুদামের খোঁজ করে সেখান থেকে হাজার হাজার গজ কাপড় উদ্ধার করেন। অবৈধ খাদ্য গুদামজাতকারীদের গুদাম খুজে বের করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গরীব অসহায় মানুষের জন্য গুদাম খুলে দেন।

- স্বাধীনতার পর দুর্নীতির অভিযোগে ২৩ জন সংসদ সদস্যকে দল থেকে বহিস্কার

- সরকারি কর্মচারিদের স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা
- প্রেসিডেন্স অর্ডার-০৯ (পিওনাইন) এর মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মচারিদের শাস্তি প্রদান।
- ১৯৭২ সালের সংবিধান

শেষ বক্তব্য: ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫ জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণে (সংসদে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর শেষ ভাষণ) বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ছিল, যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণে নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির-নাজির করে, নিজের আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে, 'ইনশাআল্লাহ্' বলে কাজে অগ্রসর হন, তাহলে জানবেন, বাংলার জনগণ আপনাদের সাথে আছে, বাংলার জনগণ আপনাদের পাশে আছে। ... ইনশাআল্লাহ্ আমরা কামিয়াব হবই।'

আজ বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আজীবনের আকাঙ্খা "স্বপ্নের সোনার বাংলা" গড়ার প্রত্যয় আজও অবিনাশী শক্তি হিসেবে আমাদের মানসপটে বিদ্যমান। আমাদের প্রিয় জননেত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শেরই সুযোগ্য উত্তরাধিকার। দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেমনি সোচ্চার ছিলেন তেমনি তাঁর আদর্শকে ধারণ ও বহন করে দুর্নীতিকে না বলে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই নির্বাচনী অঙ্গীকার, সরকারের সিদ্ধান্ত এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থানের বিভিন্ন কর্মকৌশল যদি আমরা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে ২০৪১ এ নয়, তার পূর্বেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত হবে। ইনশাআল্লাহ।

লেখক হিসেবে বঙ্গবন্ধু

শামসুজ্জামান খান [১৬]

পৃথিবীর প্রত্যেক ইতিহাস সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রনায়কই মূলত আদর্শবাদী তাত্ত্বিক, দার্শনিক বা চিন্তক; তা না হলে তিনি শুধুই রাজনীতিক মাত্র। ফলে সংস্কৃতিমনস্কতা তাঁদের ব্যক্তিত্ব গঠন ও রাষ্ট্রচিন্তায় মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই যেসব রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি এবং রাষ্ট্রদর্শন ও মানবিকতার আদর্শগত তাত্ত্বিকতায় বুৎপত্তি অর্জন করেছেন, তাঁরা লেখক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়ক হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছেন। প্রাচীন এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস জেফারসন, আব্রাহাম লিংকন, ইংল্যান্ডের উইনস্টোন লিওনার্ড চার্চিল, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু বা সেনেগালের সাবেক কবি-রাষ্ট্রপতি লিওপোল্ড সেদর সেংঘর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা এঁরা সকলেই খ্যাতকীর্তি রাষ্ট্রনায়ক, স্বাধীনতাসংগ্রামী বা মানবতাবাদী লেখক-দার্শনিক-সংস্কৃতি তাত্ত্বিক ও ইতিহাস ব্যাখ্যাতা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তার পরাৎপর মনীষী মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন বা মাওসেতুং ও হোচিমিন। অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে হিমালয় প্রতীম উচ্চতায় স্থিত হয়েছিলেন। তাঁরও এঁদের মতো একটি স্বকীয় রাষ্ট্র দর্শন ছিল, উপনিবেশ উত্তরকালে নতুন ধরনের কর্তৃত্ববাদী ও আধা ঔপনিবেশিক ধাঁচের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণনীতি ও কৌশল ছিল। এবং সে বিষয়ে তাঁর নিরন্তর সারা দেশব্যাপী জনসংযোগ, অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা প্রদান, সুচিন্তিত অমোঘ কর্মসূচি ঘোষণা এবং দীর্ঘ কারাবরণ ও নির্যাতন সহ্য করে দেশকে স্বাধীন করার গৌরবময় ইতিহাস আছে। সেই দীর্ঘ কারাবরণ কালকেও তিনি অপচয়ে যেতে দেন নি। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে লিখেছেন তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২), কারাগারের রোজনামচা (২০১৭) এবং আমার দেখা নয়াচীন (২০২০)। এই লেখালেখির ফলে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত নেহেরু প্রমুখের মতো নিজেকে ভিন্নতর উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাল্যকালে বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান বাড়িতে একাধিক খবরের কাগজ ও সাহিত্য সাময়িকী রেখে দিয়েছিলেন। কিশোর মুজিব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেসব পাঠ করায় তার মানস জীবনে সংস্কৃতি মনস্কতার ছাপ পড়ে। এর কিছুকাল পরে মাদারীপুরে পড়ার সময়ে তিনি স্বদেশী

১৬ সভাপতি, বাংলা একাডেমি

আন্দোলন ও নেতাজী সুভাষ বসুর সমর্থকদের সান্নিধ্যে আসেন। এতে ইংরেজ উপনিবেশবিরোধী বইপুস্তক, লিফলেট ও রাজনৈতিক আদর্শ ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

১৯৪০-এর দশকের শুরুতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঘনিষ্ঠ শিষ্য হওয়ার সুবাদে তৎকালীন উপনিবেশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের শীর্ষ নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যেমন তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে, তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের শীর্ষ পুরুষ কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির এবং অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ প্রমুখের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে।

বিখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সঙ্গে জীবনের প্রথম পর্বে তরুণ রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবের যে সংযোগ ঘটে তা তাঁর রাজনৈতিক জীবন গঠনে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে বলে আমরা মনে করি। পরবর্তী জীবনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হকের সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং কৃষকসহ প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপনের যে সহজাত প্রবণতা বাংলার রাজনীতির সেই মূল ধারাটিকেই বঙ্গবন্ধু আরও নিকট ঐক্যে গ্রথিত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ও নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক তাঁকে পশ্চিমি গণতন্ত্রের ধারারও সমর্থকে পরিণত করে। শুধুমাত্র এই দু'টি ধারা নয়, কলকাতায় আবুল হাশিম এবং ঢাকায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে রাজনীতি করার সুবাদে বামপন্থি এবং সমাজতান্ত্রিক ধারার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ফলত, এই তিনটি ধারার সমন্বয় সাধন করেই বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেন। অন্যপক্ষে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনের সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সখ্যের সুবাদে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সংস্কৃতিরও সমন্বয় ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর মানস-নির্মিতির ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, কলকাতায় তাঁর ছাত্রজীবনে সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের নেতৃত্বে কাজ করার যে সুযোগ পান তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতিজনের সংযোগ তাঁর চিন্তাধারাকে যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করে তেমনি রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে নব তাৎপর্য লাভ করে। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে লিখছেন :

'একটা ঘটনার দিন-তারিখ আমার মনে নাই, ১৯৪১ সালের মধ্যেই হবে, ফরিদপুর ছাত্রলীগের জেলা কনফারেন্স, শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তাঁরা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, ইব্রাহীম খাঁ সাহেব। সে সভা আমাদের করতে দিল না, ১৪৪ ধারা জারি করল। কনফারেন্স করলাম হুমায়ুন কবির সাহেবের বাড়িতে। কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব গান শোনালেন। আমরা বললাম, এই কনফারেন্সে রাজনীতি আলোচনা হবে না। শিক্ষা ও

ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হবে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬)

তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান যে রাজনীতির সংস্কৃতির সংযোগ ঘটিয়ে ছিলেন উপর্যুক্ত ঘটনাটি তার প্রমাণ। এছাড়া তিনি যখন সোহরাওয়াদী এবং আবুল হাশিম সাহেবের সঙ্গে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল গ্রুপের সঙ্গে কাজ করছিলেন তখন তাঁদের নতুন ও গণমুখী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রচার ও প্রকাশের লক্ষে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন :

ক. "এই সময়ে আবুল হাশিম সাহেব মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে একটা নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেন এবং নতুনভাবে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে পাকিস্তানের দাবী হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য এবং দুই ভাই যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সুখে বাস করতে পারে তারই জন্য। তিনি আমাদের কিছু সংখ্যক কর্মীকে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের নিয়ে রাতে আলোচনা সভা করতেন মুসলিম লীগ অফিসে। ...হাশিম সাহেব আমাদের বললেন, একটা লাইব্রেরি করতে হবে, তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে" (পৃ.-২৪ অসমাপ্ত আত্মজীবনী)। হাশিম সাহেব ছিলেন মওলানা আজাদ সোবহানীর ভক্ত। তিনি বিখ্যাত ফিলোসফার ছিলেন। মওলানা আজাদ সোবহানী সাহেবকে হাশিম সাহেব আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন কলকাতায়। আমাদের নিয়ে তিনি ক্লাশ করেছিলেন (প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃ-৪১)।

খ. "হাশিম সাহেব নিজেই সম্পাদক হলেন এবং কাগজ বের হল। আমরা অনেক কর্মীই রাস্তায় হকারী করে কাগজ বিক্রি করতে শুরু করলাম। কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবই কাগজের লেখাপড়ার ভার নিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। ব্যবহারও অমায়িক ছিল। সমস্ত বাংলাদেশেই আমাদের প্রতিনিধি ছিল। তারা কাগজ চালাতে শুরু করল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে কাগজটা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল। হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে কাগজটা পড়তেন। এর নাম ছিল 'মিল্লাত'।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-৪০)

উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহ থেকে বোঝা যায় তরুণ বয়সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে একটি শিল্প-সংস্কৃতি চেতন মন ও সাহিত্যিক সত্তা গড়ে ওঠে। স্মর্তব্য, একদিকে তাঁর অসাধারণ রবীন্দ্রানুরাগ এবং অন্যদিকে পূর্ব বাংলার সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতের তিন আইকন জসীমউদ্দীন, জয়নুল আবেদিন, আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে সখ্য ও বন্ধুত্ব এবং বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সার, সরদার ফজলুল করিম ও মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তাঁর

জীবনচেতনায় এনেছিল এক বহুমাত্রিক গভীরবোধ ও সংবেদনশীলতা। এই মতো একজন সংস্কৃতিসংলগ্ন রাজনৈতিক নেতা দীর্ঘ কারা নির্যাতন সহ্য করেও স্বপ্ন দেখেন ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদী অপশাসন থেকে দেশ-মুক্তি ও জনগণের স্বাধীনতার, তখন যদি তিনি কলম হাতে নিয়ে বসেন তখন তাঁর হাত থেকে ফোটে সাহিত্যের পুষ্পিত সৌরভ। এই পটভূমিকায় বিকশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তা।

দুই

বঙ্গবন্ধুর লেখক হয়ে ওঠার ইতিহাস আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছার ভূমিকাই প্রধান। তিনিই তাঁকে অনুপ্রাণিত করতেন আত্মজীবনী লিখতে। সেই সুবাদে লেখা বঙ্গবন্ধুর তিনখানি বই সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের প্রকাশনা ও বই বিক্রির ইতিহাসে এক এক নতুন রেকর্ড। অসমাপ্ত আত্মজীবনী লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়েছে বেশ আগেই এবং কারাগারের রোজনামচার বিক্রিও তেমনি। আমার দেখা নয়াচীনও (২০২০) পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের প্রকাশনার ইতিহাসে আর কোনো রচনা এমন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা। বইটি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ঘটনা সমৃদ্ধ বই হলেও তাঁর ভাষার গাঁথুনি আকর্ষণীয় এবং বেশ প্রাঞ্জল। যেমন :

ক. ‘আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোটসময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনোমতে দিন কাটাছেন। আর একটা দালান ভেঙে পড়েছে, যেখানে বিষাক্ত সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা আজ তাদের অনেকেরই নাই। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি’ (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-৩)।

খ. শেখদের সঙ্গে অত্যাচারী নীলকর রাইনের মামলার বয়ানে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন :

‘শেখরা তখনো দুর্বল হয়ে পড়ে নাই। রাইনের লোকদের সঙ্গে কয়েক দফা দাঙ্গা হাঙ্গামা হল এবং কোর্টে মামলা হল।’ মামলায় রাইন অভিযুক্ত হন। কুদরতউল্লাহ রাইনকে জরিমানার সুযোগ পান। শেখ কুদরতউল্লাহ আধা পয়সা জরিমানা করেন। রাইন বলেছিল কত টাকা চান দিতে রাজি আছি, আমাকে অপমান করবেন না। তাহলে ইংরেজ সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না; কারণ, ‘কালা আদমি ‘আধা পয়সা’ জরিমানা করেছে।’ কুদরতউল্লাহ উত্তর করেছিল বলে কথিত আছে : ‘টাকা আমি গুণিনা, মেপে রাখি।’ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫)

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন :

“আমাদের বাঙালিদের মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হলো ‘আমরা মুসলমান’, আর একটা হলো আমরা বাঙালি। পরশ্রীকাতরতা আর বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধ হয় দুনিয়ার কোনো ভাষাই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, ‘পরশ্রীকাতরতা’। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে পরশ্রীকাতর বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্য বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে (প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃ-৪৭-৪৮)।

উপর্যুক্ত বইয়ে বঙ্গবন্ধুর বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষা ভালোবাসার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পাই নিম্নোক্ত ভাষায় :

“পরের দিন নৌকায় আমরা রওয়ানা করলাম...পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালী গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন...গান গাইছিলেন তখন মনে হয়েছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে।... আমি আব্বাসউদ্দিন সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন : মুজিব বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলা কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে। ...বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে” (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ-১১১)।

তিন

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সংবেদনশীল মানুষ। তিনি ভালোবাসতেন বাংলাকে, বাংলার মানুষকে, পশুপাখি,

নদী আর শ্যামল সবুজ প্রকৃতিকে। এই মহান মানুষটির জীবন দেশদ্রোহী কুলাঙ্গারা শেষ করে দেয়া মাত্র ৫৪ বছরে। এই স্বল্পকালের জীবনের মধ্যে এক যুগেরও বেশি সময় কেটেছে তাঁর কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের এইমতো নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও এই আপসহীন নেতার মনোবল ভাঙ্গতে পারেনি। জেল জীবনকেও তিনি অত্যন্ত সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অমূল্য রচনাসমূহ জেল জীবনেরই সৃষ্টি। তিনি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কারাগারের রোজনামচা'য় জেলের নানা পরিভাষা, রীতি-কেতা নিয়মকানুন যে অভিনিবেশ, অনুপুঙ্খতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন আর কোনো কারা সাহিত্যেই তেমন হৃদয়গ্রাহী বিবরণ মেলা ভার। জেলের দুঃখ-কষ্টের বেদনাময় কথা যেমন বলেছেন, তাঁর মধ্যেই আবার বাগান করা, দুটো হলুদ পাখির সঙ্গে তাঁর সখ্য ও তাদের হারিয়ে যাবার দুঃখের গল্প বলা, রান্না করা, অন্য রাজবন্দিদের খোঁজখবর নেয়া এবং বিভিন্ন মেয়াদের অন্য কয়েদিদের স্বভাব ও আচরণের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ যে দক্ষতায় তুলে এনেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে।

আমরা উপর্যুক্ত বইয়ের কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করি। জেলের ভেতরে ম্যালা নিয়মকানুন, সেসব যে কত বিচিত্র আর উদ্ভাবনাময় তা তো আমরা ঘুনাক্ষরেও কিছুই জানি না। বঙ্গবন্ধু অনুপুঙ্খভাবে এবং কিছু কৌতুকময়তায় তা তাঁর লেখায় ধরিয়ে দিয়েছেন। জেলের কিছু নিয়মকে বলা হয় দফা। সে-সব দফার নাম আমরা জীবনেও শুনিনি। যেমন, শয়তানের কল, ডালচাকি দফা, রাইটার দফা, চৌকি দফা, জলভরি দফা, ঝাড়– দফা, বন্দুক দফা, পাগল দফা, ছোকড়া দফা ইত্যাদি। এর কিছু কিছু দফার নাম শুনে বিষয় হয়তো অনুমান করা যায় কিন্তু বন্দুক দফা, শয়তানের কল, ডালচাকি এইসব দফার বিষয়ে অনুমান করাও কঠিন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বন্দুক দফার কথা। বঙ্গবন্ধু এই দফা সম্পর্কে তাঁর লেখায় বলেছেন :

"আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন বন্দুক দফা কেন বলা হয়? একটা গল্প আছে এর পেছনে। বাঁশ দিয়ে কাঁধে নিয়ে টিনে করে পায়খানার ময়লা দূরে নিয়ে লাল গাড়িতে ফেলতে হয়। তাই টিন ঘাড়ে করে টানতে টানতে দাগ হয়ে যায়। একজন কয়েদি মেথর দফায় কাজ করতে করতে তার কাঁধে দাগ হয়ে যায়। একবার তার ভাইরা তাকে দেখতে এসে কাঁধের দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করে দাগ কিসের, তার উত্তরে মেথর কয়েদিটা বলে, 'আমি বন্দুক দফায় জেলখানায় কাজ করি, সিপাহি সাহেবদের বন্দুক আমার বহন করে বেড়াতে হয়। তাই দাগ পড়ে গেছে।' সেই হতে এই দফার নাম বন্দুক দফা" (কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-৩৩)।

জেলে এই ধরনের আজব সব দফা ছাড়াও লৌকিক বুলির কিছু পরিভাষা আছে, যেমন, কেস্টাকোল। বঙ্গবন্ধু তাঁর বইয়ে বলেছেন :

‘শাহাবুদ্দিনকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেস্টাকোল কি রে ভাই? ও তো হেসেই অস্থির। আমাকে বলল, দেখেন তো ইংরেজি ডিকশনারিতে আছে নাকি। আমি বললাম জীবনে তো শুনি নাই, থাকতেও পারে। ইংরেজি তো খুব ভাল জানি না। পুরনো ডিভিশনারি দেখেন। কয়েদিরা সকলেই হাসে। আমি তো আহাম্মক বনে গেলাম, ব্যাপার কি! পরে হাসতে হাসতে বলল, কেস-ফাইল, কেস-টেবিল, কেসটাকোল। কয়েদিরা একে এই নাম বলে ডাকে’ (কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-৩১)।

জেলখানা এক ভিন্ন দুনিয়া। চোর, ডাকাত, পকেটমার আর ঘাগু কয়েদিরা সেখানে কত অন্ধি-সন্ধি, অপরাধপ্রবণ কলাকৌশল আবিষ্কার করে বেঁচে থাকে। তার এক নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু :

‘আমি জেলে এসে এবার ভালই পাকা হলাম। গলার ভিতর ‘খোকড়’ না ভার করা শিখলাম। পেশাদার ডাকাত, চোরদের গলায় এক প্রকার গর্ত করা থাকে; এরা ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করে খোকড় করে। ...খোকড় দুই রকমের কাঁচা ও পাকা। কাঁচা খোবড় বন্ধ হয়, বেশি কিছু রাখা যায় না। ...মাথায় মারলে বেরিয়ে আসে। ...পাকা খোকড়ে ৫/৭টা মোহর অথবা ৮ থেকে ১০টা গিনি একসাথে রাখা যায়। কাঁচা টাকা প্রায় ৭/৮টা একসাথে রাখা যায়। এমনকি ১০০ টাকার নোট।’ ‘সিগারেটের কাগজ দিয়ে মুড়ে দুই তিনখানা এক সাথে রাখা যায়। এমন বিপদজনক উপায় মারপিট থেকে বাঁচার জন্য পুলিশের ভেট দেখার জন্য রাখা হয়’ (কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা ৫২)। লেখার হাত পাকা বলেই এসব বঙ্গবন্ধু বিশদে লিখেছেন।

বঙ্গবন্ধু জেলে প্রচুর পড়াশোনা করতেন। আর প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে পড়তেন খবরের কাগজ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব ক্লাসিকসও তিনি জেলে অবস্থানকালে পড়েছেন। একটা জায়গায় বলছেন তিনি :

‘ঘরে এসে বই পড়তে আরম্ভ করলাম। এমিল জোলার তেরেসা রেকুইনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটা চরিত্র জোলা তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে। এই বইয়ের ভিতর কাটিয়ে দিলাম দুই তিন ঘণ্টা সময়’ (কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-১০১)।

আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ছাড়াও সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, শওকত ওসমান, শহীদুল্লা কায়সার প্রমুখের লেখাও ছিল তাঁর খুব প্রিয়। প্রতিদিন অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ বিখ্যাত সাংবাদিকদের রাজনৈতিক কলাম পড়তেন। সেইসঙ্গে পড়তেন বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস এবং সাহিত্য। তিনি

লিখছেন : '১৭৮৯ সালের ১২ই জুলাই ফরাসি দেশে শুরু হয় বিপ্লব। প্যারিস নগরীর জনসাধারণ সাম্য, মৈত্রী, ও স্বাধীনতার পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করে। ১৪ই জুলাই বাস্তিল কারাগার ভেঙ্গে রাজবন্দিদের মুক্ত করে এবং রাজতন্ত্র ধ্বংস করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৭ বৎসর পরেও এই দিনটি শুধু ফ্রান্সের জনসাধারণই শ্রদ্ধার সাথে উদ্যাপন করে না, দুনিয়ার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসাধারণও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে' (কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-১৬১)। ১৫ই জুলাই ১৯৬৬-'র রোজনামচায় তিনি তাঁর জেল জীবনের একটি নিষ্ঠুর চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

'কি ব্যাপার, আমি যে ঘরে থাকি, তা মাপামাপি করছে কেন? চল্লিশ ফুট লম্বা, চারফুট চওড়া, কয়টা জানালা, কয়টা দরজা সব কিছু লিখে নিতেছে জমাদার সাহেব। বললাম, ব্যাপার কি? সরকার জানতে চেয়েছে? আরও একটু লিখে নেন না কেন, দক্ষিণ দিকে ছয়টা জানলা, কিন্তু তার এক হাত দূরে চৌদ্দ ফুট উঁচু দেওয়াল, বাতাস শত চেষ্টা করেও ঢুকতে পারে না আমার ঘরে। জানলা নিচে, দেওয়াল খুব উঁচু। উত্তর হলো, ও সব লেখা চলবে না। লেখুন না আর একটু দেওয়ালের অন্য দিকে গরুর ঘর, পূর্বদিকে পনের ফিট দেওয়াল ও নূতন বিশ। ভয়ানক প্রকৃতির লোক যারা জেল ভেঙে দুই একবার পালাইয়াছে তাদের রেখেছিল এখানে। আর উত্তর দিকে ৪০ সেল, সেখানে ৪০ পাগলকে রেখেছে। আর পশ্চিম দিকে একটু দূরেই ৬ সেল ও ৭ সেল, যেখানে সরকার একরারী আসামি রেখেছেন। আর এরই মধ্যে 'শেখ সাহেব'। তিনি বললেন 'ও বাত হামলোক নেহী লেখ্নে ছাকতা হায়, নকরি নেহি রহে গা" (কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-১৬৩)।

সহজ, সরল ও আকষর্ণীয় গদ্যে তিনি তাঁর জেল জীবনের বাগান চর্চার নান্দনিক অভ্যাসের কথা বলেছেন এভাবে :

ক. "দুপুরের দিকে সূর্য মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে শুরু করেছে। রৌদ্র একটু উঠবে বলে মনেয় হয়। বৃষ্টি আর ভাল লাগছে না। একটা উপকার হয়েছে আমার দুর্বার বাগানটার। ছোট মাঠটা সবুজ হয়ে উঠেছে। সবুজ ঘাসগুলি বাতাসের তালে তালে নাচতে থাকে। চমৎকার লাগে, যেই আসে আমার বাগানের দিকে একবার না তাকিয়ে যেতে পারে না। বাজে গাছগুলো আমি নিজেই তুলে ফেলি। আগাছাগুলোকে আমার বড় ভয়, এগুলো না তুললে আসল গাছগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আমাদের দেশের পরগাছা রাজনীতিবিদ যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাদের ধ্বংস করে এবং করতে চেষ্টা করে।" (কারাগারের রোজনামচা পৃ-১১৭)

খ. “আমার ঘরের দরজার কাছে একটা কামিনী ও একটা শেফালী গাছ। কামিনী যখন ফুল দেয় আমার ঘরটা ফুলের গন্ধে ভরে থাকে। একটু দূরেই দুইটা আম আর একটা লেবু গাছ। বৃষ্টি পেয়ে গাছের সবুজ পাতাগুলি যেন আরও সবুজ আরও সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় ভাল লাগল দেখতে।” (পৃ. ১১৯)

বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হলেও তাঁর মতো করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিশ্ব শান্তি আন্দোলনেরও একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান খান। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন :

‘আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই এই আমাদের শ্লোগান।’ এরপর লিখছেন, ‘সেপ্টেম্বর মাসের ১৬/১৭ তারিখ খবর এলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিরা শান্তি সম্মেলনে যোগদান করবে। আমাদেরও যেতে হবে পিকিং এ, দাওয়াত এসেছে। সমস্ত পাকিস্তান থেকে ত্রিশজন আমন্ত্রিত। পূর্ব বাংলার ভাগে পড়েছে মাত্র পাঁচজন। আতাউর রহমান খান, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, উর্দু লেখক [ইবনে] ইউসুফ হাসান ও আমি’ (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-২২১)।

বঙ্গবন্ধু চীন সফর করেন দুবার। প্রথমবার ভাষা-আন্দোলনের জন্য জেল জীবন থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে এবং ১৯৫৭ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হিসেবে। ১৯৫২ সালে জেল থেকে বেরিয়ে শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে নয়াচীনে যান অক্টোবর মাসে। মওলানা ভাসানী সুযোগ পেলে বিপ্লব-পরবর্তী নয়াচীনে যেতে বলেছিলেন, স্বল্প সময়ে তারা কত উন্নতি করেছে সেটা দেখতে। বঙ্গবন্ধু এ বইয়ের সূচনাতেই বলে নিয়েছেন : ‘অনেকে বলতে পারেন কমিউনিস্টদের শান্তি সম্মেলনে আপনারা যোগদান করবেন কেন? আপনারা তো কমিউনিস্ট না। কথাটা সত্য যে আমরা কমিউনিস্ট না। তথাপি দুনিয়ায় আজ যারাই শান্তি চায় তাদের শান্তি সম্মেলনে আমরা যোগদান করতে রাজি। ...কারণ যুদ্ধে দুনিয়ার যে ক্ষতি হয় তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করতে পারি।’ (আমার দেখা নয়াচীন, পৃ. ১৯)। এ বক্তব্যে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করি। এ বইয়ের কিছু অংশ :

“শান্তি সম্মেলন শুরু হল। প্রথমেই অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন তাঁর বক্তৃতা পড়ে শোনালেন। নয়াচীনের পিতা সান ইয়াৎ-সেনের নাম আপনারা জানেন, যিনি দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেন। বিদেশীদের দেশ থেকে তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু গড়ে যেতে পারেন নাই। তার পূর্বে তাঁর মৃত্যু

হয়েছিল। ম্যাডাম সানইয়াৎ- সেন তাঁরই স্ত্রী।

চিয়াং কাইশেকের নাম আপনারা সকলে জানেন যিনি সান ইয়াৎ-সেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এবং দুই নেতা দুই বোনকে বিয়ে করেছিলেন। ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন, চিয়াং কাইশেকের স্ত্রীর বড় বোন। দুঃখের বিষয় দেশের সাথে স্বামী-স্ত্রী বেইমানী করেছিল বলে আর দেশে যেতে পারে না। জনগণ তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই ফরমোজা দ্বীপে আমেরিকান সাহায্য নিয়ে কোনো মতে বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে, কিন্তু কেহ গ্রাহ্য করে না। কারণ, সকলেই জানে দেশের থেকে বিতাড়িত আমেরিকার দালাল।"

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে তাঁদের দেশের শান্তি আন্দোলন, সামাজিক অগ্রগতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন... আমিও বক্তৃতা করলাম বাংলা ভাষায়। ভারতবর্ষ থেকে বক্তৃতা করলেন মনোজ বসু বাংলা ভাষায়। বাংলা আমার মাতৃভাষা, মাতৃভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু কিছু জানে... এই সম্মেলন এগারো দিন চলে।

আমার দেখা নয়াচীন বইয়ে বঙ্গবন্ধু গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিপ্লবোত্তর চীনের সমাজ-সংস্কৃতি, প্রকৃতি-পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটা অংশ "আমি বাহিরের দিকে চেয়ে দেশটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। মনে এলো এ তো আমার পূর্ব বাংলার মতো সকল কিছু। সবুজ ধানের ক্ষেত, চারিদিকে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে মাটির ঘরের গ্রাম, ছোটো ছোটো নদী, ট্রেনটা পার হয়ে যাচ্ছে। অনেকে আবার কোদাল দিয়ে জমি ঠিক করছে। বেশ লাগছে দেশটা (আমার দেখা নয়াচীন, পৃ. ৩২)। আর একটা অংশ : সন্ধ্যায় আমরা ক্যান্টনে পৌঁছলাম। ...ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে ফুলের তোড়া, স্লোগান দিয়েছে। ...আমাদের হাত ধরে নিয়ে চললো কোনো সংকোট নাই, আমরা যেন তাদের কত আপন, কতকালের পরিচয়। চোখে মুখে আনন্দ ধরে না। (পৃ. ঐ)।

তারপরে বর্ণনা পাই তাঁর মূল আগ্রহের বিষয়ে। তিনি বিপ্লবের সাফল্যের পর লাল চীন বাহিনীর ক্যান্টন অধিকারের শেষে স্থানীয় জনগণের মনোভাব বুঝতে ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি জানা এক ছাত্রের সঙ্গে আলাপে জানতে পারেন : "নয়াচীন বাহিনী যখন শহরে এলো আমরা ৫/৭ দিন ভয়েতে দরজা খুলি নাই। ভাবতাম বুঝি অত্যাচার করবে, কারণ অনেক অত্যাচারের কাহিনী শুনেছি। কিন্তু দেখলাম এরা এসেই ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে শুরু করলো। একদল চিৎকার করে বলতে বলতে গেল : 'তোমরা নির্ভয়ে কাজকর্ম করো, দোকান খোল,

ব্যবসা-বাণিজ্য চালাও। ঘরের বাহির হও। কোন ভয় নাই। আমরা তোমাদের ভাই, তোমাদের সেবাই আমাদের কাজ।" (পৃ. ৩৪)

উপসংহারে বঙ্গবন্ধু কত বিচিত্র ও অভিনব অভিজ্ঞতা এবং কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য রেখে গেছেন মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ তার একটা চিত্র তুলে ধরি। পাকিস্তানের প্রথমদিকে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে যান সোহরাওয়ার্দী এবং মিয়া ইফতেখার উদ্দীনসহ সেখানকার প্রগতিশীল নেতাদের পূর্ব-বাংলার দুঃশাসন সম্পর্কে জানাতে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুব্ধ হয়। তিনি ভারত হয়ে ট্রেনে পূর্ব-বাংলায় ফিরে আসেন গ্রেফতারের ঝুঁকি নিয়ে। তাই খুলনায় নেমে গোয়েন্দাদের যেভাবে ফাঁকি দিয়ে সেদিনের মত গ্রেফতার এড়ালেন তা এ রকম। বঙ্গবন্ধুর বয়ান : "সকল যাত্রী নেমে যাওয়ার পরে আমার পাঞ্জাবি খুলে বিছানার মধ্যে দিয়ে দিলাম। লুঙ্গি পরা ছিল, লুঙ্গিটা একটু উপরে উঠিয়ে বেঁধে নিলাম। বিছানাটা ঘাড়ে, আর সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম। কুলিদের মত ছুটতে লাগলাম জাহাজ ঘাটের দিকে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকরা তো আছেই, চিনতে পারল না (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৪৬)। কীভাবে তিনি আমাদের জন্য স্বাধীনতা এনেছেন এ তার এক অমর গাঁথা।

বঙ্গবন্ধু লেখক হিসেবে যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁর ফলে তাঁর তিনখানা বই-ই চমৎকার হয়েছে। তাঁর হাতের লেখায় নৈপুণ্যের ছাপ আছে। তিনি রাজনীতিতে যেমন মহতের তালিকায় উঠে এসেছেন, শুধু লেখালেখি করলেও পেতেন শীর্ষ আসন।

রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু

কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী [১৭]

বাঙালির শক্তি ও সাহসের উৎস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে শহীদ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

বঙ্গবন্ধুর মহাকাব্যিক রাজনৈতিক জীবনকে ছোট পরিসরে নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে বিশেষ করে রাজনীতির কবি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর উপর আলোচনা করা যায়। এই আলোচনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আগামীর সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দিক নির্দশনার বাতিঘর হয়ে থাকবে। বক্তব্যের শুরুতে আমি বঙ্গবন্ধুকে স্বশরীরে দেখার স্মৃতিচারণা করতে চাই। আমি যখন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছিলাম, তখন ১৯৭১ সালের ০৭ই মার্চের ভাষণের সময়সহ বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন প্রোগামে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর বর্ণিল রাজনৈতিক জীবন বাঙালি জাতির জন্য আত্মত্যাগের নিদর্শন। যার জন্য ২০০৪ সালে বিবিসি কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আমরা ভবিষ্যত বাংলাদেশকে কিভাবে এবং কোন অবস্থায় দেখতে চাই, কিভাবে সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করতে চাই, তার নির্দেশনা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ তরুণ প্রজন্মের কাছে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা জরুরী। সেই তুলে ধরাটা যেন বস্তুনিষ্ঠতার সাথে এবং ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের আলোকে হয়, সে দিকে আমাদের সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, এই গুরুত্ব বুঝতে হলে বাঙালি জাতিসত্ত্বার হাজার বছরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। চর্যাপদের সময়কাল থেকে বাঙালি জাতির ইতিহাস বিকাশমান। তারপর থেকে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শাসন থেকে শুরু করে হাজার বছর ধরে এই বাঙালির জাতিস্বত্বার উন্মেষ ঘটে। সেই দীর্ঘ ইতিহাসে চলমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শুধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিই নন, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রথম সার্বভৌম বাঙালি।

---

১৭ প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও সাবেক মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিক্রমার ইতিহাস যথাযথভাবে সংরক্ষিত নেই। সেই জন্য বাঙালির ইতিহাস বিমুখতাই দায়ী। বঙ্কিম চন্দ্র, নিহার রঞ্জনসহ বিভিন্ন লেখক-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিকরা তাদের লেখনিতে বাঙালির ইতিহাস বিমুখতার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বাঙালির ইতিহাসকে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরতে হবে।

উনিশ শতকে সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে বাঙালি জাতির সামগ্রিক জাগরণ ঘটেছিলো। এজন্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স, উইলিয়াম কেরিসহ বিদেশিদের অবদান স্মরণ করা যেতে পারে। একই সাথে বাঙালির রাজনৈতিক জাগরণও ঘটেছিলো সেই সময়। উনিশ শতকে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস, যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন একজন বাঙালি। তৎপরবর্তীতে মুসলিম লীগের মতো রাজনৈতিক সংগঠনের যাত্রা ঢাকা থেকেই হয়। অর্থাৎ উনিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের সব বড় বড় ঘটনায় বাঙালিদের সক্রিয় ও অগ্রগামী অংশগ্রহণ ছিলো অন্য জাতি গোষ্ঠির মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

বাঙালি জাতি ছিলো বিপ্লবী জাতি। সারা বিশ্বের বিপ্লবী আইকন চে গুয়েভারার রাজনৈতিক চেতনা, তার জীবন ও কর্ম এবং লাটিন আমেরিকার ভাগ্য পরিবর্তনে আমরা তাঁর অবদান সম্পর্কে সবাই জানি। কিন্তু তারও আগে থেকেই বাঙালিরা বিপ্লবের চেতনা করতো। এ ক্ষেত্রে বাংলার অন্যতম কয়েকজন বিপ্লবী নেতার প্রণিধানযোগ্য নাম স্মরণ করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখসারিতে ছিলেন বাঘা যতিন, ক্ষুদিরাম, তিতুমির, প্রীতিলতা, রাসবিহারী বসু, সুভাষবসুসহ প্রমুখ।

বাংলার এতো এতো বিপ্লবী নেতা থাকার পরও বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। চীনা হান এবং আরব জাতিসত্বার পর বাঙালি তৃতীয় বৃহত্তম ভাষাভিত্তিক জাতি (যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহারকারী হিসেবে সপ্তম) হওয়া সত্বেও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি বাঙালিরা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম নেতা যিনি বাঙালিকে একটি জাতি হিসেবে, জাতির অভিপ্রায় স্বরূপ স্বভূমি অর্জন এবং জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালি জাতিকে সংঘবদ্ধ করেন এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতি রাষ্ট্র। আর সে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধুকে শুধু হাজার বছর নয়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাজনীতির কবি। ইরেজি ভাষার ব্রিটিশ সাময়িকী নিউজইউক তাদের প্রচ্ছদে ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ নিয়ে খবর পরিবেশনা করে। সেই প্রচ্ছদ খবরেই সাময়িকীটি বঙ্গবন্ধুকে পয়েট অব পলিটিক্স বা রাজনীতির কবি হিসেবে উপাধি দেয়। সেই সময়

খবর সংগ্রহের জন্য ঢাকায় আটকে পড়া বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে নিউজউইক সাময়িকীর সাংবাদিক লরেন জেনকিন্সও ছিলেন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ গণহত্যার রাতে অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে জেনকিন্স তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের একমাত্র পাঁচ তারকা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে আটকা পড়েন এবং এই সেই রাতে খবর সংগ্রহের জন্য বের হতে গেলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি জেনকিন্স এর লেখায় পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এই জেনকিন্সই তার লেখনিতেই বঙ্গবন্ধুকে বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তাঁকে রাজনীতির কবি হিসেবে অভিহিত করেন। মূলত বাঙালি জাতির অভিপ্রায় অনুযায়ী দল-মত-নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সেই জাতির অভিষ্ঠ লক্ষ্য তথা স্বাধীনতার অর্জনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যই জেনকিন্স বঙ্গবন্ধুকে এই উপাধি দেন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আব্দুর রাজ্জাক তার লেখায় বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির একমাত্র নেতা, যিনি বাঙালি জাতিকে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়কে বাস্তবে রূপদান করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধী বা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র মতো নেতারাও জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কিংবা সুভাস বসুর মতো নেতাও তাঁর জাতিকে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে প্রস্তুত করে তুলতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুই একমাত্র নেতা, যিনি বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে ধারণ করেছিলেন নিজের রাজনৈতিক চেতনায়। তারপর বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের জন্য অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। পাল শাসকরা নয়, ইলিয়াস শাহ নয়, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নয় এমনকি নবাব সিরাজুদ্দৌলাও নয়, বঙ্গবন্ধুই বাঙালি জাতির ইতিহাসে একমাত্র বাঙালি সার্বভৌম নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

বাংলাদেশের জন্মক্ষণ ১৯৭১ সালের মার্চের ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, বাঙালির দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে একজন সার্বভৌম নেতা হিসেবে বাঙালি জাতিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সমগ্র দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রশাসনসহ সকল প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর ইশারায় চলেছে সেই সময়। তাঁর নির্দেশনায় সমগ্র জাতি জেগে উঠেছিল এবং তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলো। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের সেই ভাষণেই বঙ্গবন্ধু মোট ৩৫টি দিক নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি সেনাবাহিনী বিভিন্ন নির্দেশ জারি করলেও সমগ্র জাতি সেনাবাহিনীর নির্দেশ না মেনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। বঙ্গবন্ধুর নিষেধের কারেণই সচিবালয় খোলা হয় নি, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ ছিলো, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতোই ব্যাংকগুলো মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য খোলা ছিলো, জেলা প্রশাসকরাও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো কাজ

করেছেন। বঙ্গবন্ধু তখন শাসক ছিলেন না।বঙ্গবন্ধুর কোনো মুকুটও ছিলো না সেই সময়। তারপরও বঙ্গবন্ধু তখন যা যা নির্দেশ করেছেন, বাঙালি জাতি সেসব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, যা বঙ্গবন্ধুকে একজন সার্বভৌম নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু প্রথম সার্বভৌম শাসক হন। একজন সার্বভৌম শাসক হিসেবে বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ওয়াশিংটন কিংবা লাতিন আমেরিকার নেতা সাইমন বলিবারের থেকেও এগিয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুই ছিলেন বাঙালি জাতির প্রথম সার্বভৌম বাঙালি, প্রথম সার্বভৌম বাঙালি শাসক, সার্বভৌম বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। এ জন্যই বঙ্গবন্ধু শুধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিই নন, বরং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

বঙ্গবন্ধু হলেন চিরন্তন সত্তা, জাতির শ্রেষ্ট বীর। বঙ্গবন্ধুকে জর্জ ওয়াশিনটনের সাথে তুলনা কার যায়, বঙ্গবন্ধুকে সাইমন বলিবারের সাথে তুলনা করা যায়, বঙ্গবন্ধুকে আব্রাহাম লিংকনের সাথে তুলনা করা যায়, বঙ্গবন্ধুকে মহাত্মা গান্ধীর সাথে তুলনা করা যায়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহাকাব্যের মহানায়ক। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পৌরাণিক মহাকাব্যের কিংবদন্তী মহানায়ক। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে দেশে ফেরাকে ওডিসি কাব্যের বীর ওডিসিউসের সাথে তুলনা করা যায়। বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে বহুমাত্রিক রূপে ধরা দিয়েছেন। অথচ সেই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর শবযাত্রাটা আমরা করতে পারি নি। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকণ্ডের পর জাতিকে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে হয়েছে। তারপর বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশে ফিরে আসেন। দীর্ঘ ২১ বছর পর আবারও আমরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পাই, যা সামরিক শাসনের সময় একরকম নিষিদ্ধ ছিলো। এখন এই বাংলাদেশেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে পারছি।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিব বর্ষ শুধুমাত্র বছরব্যাপী আয়োজন নয়, আমাদের পরবর্তী উপজীব্য হবে মুজিব চিরন্তন। করোনার কারণে মুজিব শতবর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন না করতে পারায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী মুজিব বর্ষের উদ্‌যাপন ২৬ মার্চের পরিবর্তে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশের পুনর্গঠনে হাত দেন। বঙ্গবন্ধু যখন ১০ জানুয়ারি যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ বা ধ্বংসস্তুপের বাংলাদেশে ফিরে আসেন, তখন বন্দরে কোনো জাহাজ ভিড়তে পারতো না, চারদিকে ছিলো কান্না আর হাহাকার, তখন তিনি পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। বঙ্গবন্ধুর অনেকগুলো পুনর্গঠন কাজের মধ্যে ছিলো সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অবকাঠামোর উন্নয়ন, নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন, ভারত প্রত্যাগত এক কোটি শরনার্থীর ব্যবস্থা করা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার, যুদ্ধবন্দীদের ব্যবস্থা করা, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত বাঙালিদের পুনর্বাসন, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি

আদায়, সড়ক-বন্দর মেরামত ও সচলকরণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী কার্যক্রম মোকাবেলাসহ সদ্য স্বাধীন দেশের পুর্নঃগঠনে নানা উদ্যোগ গ্রহণ। এমন একটি সময়ে যখন বঙ্গবন্ধু দেশকে গড়ে তুলতে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করে নিরলসভাবে কাজ করছিলেন, ঠিক তখনই ৭১-এর পরাজিত শক্তি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্র, বামদের হঠকারী কার্যকলাপের (সর্বহারা নামে পাটের গুদামে আগুন দেয়া) ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। যখন তিনি দেশটাকে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসেন এবং জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য পরবর্তী কর্মসূচি হাতে নেন, তখনই তাঁকে থামিয়ে দেয়া হয়।

ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর আদর্শকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলো। তারা ব্যক্তি শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পেরেছে কিন্তু তাঁর আদর্শ, চিন্তা, চেতনা শেষ করতে পারে নাই। তাই তো বঙ্গবন্ধু চিরন্তন। তিনি চিরন্তন আলোকবর্তিক হয়ে সমস্ত বাঙালির মাঝে, সমস্ত বিশ্বের কাছে বিশ্ববন্ধু হিসেবে তিনি চিরকাল আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন আলোকবর্তিকা হয়ে। সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনিক ভাবনা/ দূরদৃষ্টি তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এবং চিরন্তন বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরার জন্য আরও কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি যে শ্রদ্ধা জানানোর যাত্রা, সেই যাত্রাও অব্যহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে থাকবেন, আলোকবর্তিকার অগ্নিশিখা হয়ে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকবেন/বেঁচে থাকবেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে চিরঞ্জীব এবং চিরন্তন হয়ে থাকবেন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।